Dhaka University Institutional Repository

# এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

## ভাটি অঞ্চলের গান: আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা (উনিশ ও বিশ শতক)

**Songs of Low-Lying Areas ofBangladesh: A Critical Analysis of Socio-Economic Perspective of Nineteenth and Twentieth Centuries.**

তত্ত্বাবধায়ক : ড. আশফাক হোসেন

অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক : তৌহিদা আকতার

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০৬

শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# সূচিপত্র


| | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ০১. | ভূমিকা | ০১-৮ |
| ০২. | প্রকশনা পর্যালোচনা | ০৯-১১ |
| ০৩. | তাত্ত্বিক কাঠামো | ১৩-১৯ |
| ০৪. | অধ্যায় বিভাজন | ২০-২১ |
| ০৫. | প্রথম অধ্যায় ভাটি অঞ্চলের গানের সংজ্ঞা | ২২-৩৮ |
| ০৬. | দ্বিতীয় অধ্যায় : ভাটি অঞ্চলের গান : ঐতিহাসিক পটভূমি, পরিচিতি ও পরিবেশণ নীতি | ৩৮-১৫৮ |
| ০৭. | তৃতীয় অধ্যায় : বিনোদনের ধারা হিসেবে ভাটি অঞ্চলের গান | ১৫৯-১৬২ |
| ০৮. | চতুর্থ অধ্যায় : ভাটি অঞ্চলের গানে আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ব | ১৬২-১৬৮ |
| ০৯. | পঞ্চম অধ্যায় : লালনের গানের সাথে ভাটি অঞ্চলের গানের যোগসূত্র | ১৬৮-১৭২ |
| ১০. | ষষ্ঠ অধ্যায়: ভাটি অঞ্চলের গানে কী পরিবর্তন এসেছে ও করণিয় | ১৭২-১৭৬ |
| ১১. | সপ্তম অধ্যায়: ভাটি অঞ্চলের গানগুলোকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় | ১৭৭-১৮১ |
| ১২. | উপসংহর | ১৮২-১৯০ |
| ১৪. | তথ্যপঞ্জি | ১৯১-১৯৩ |
| | ক. সাক্ষাতকার | ১৯৩-১৯৪ |
| | খ. গানের সিডির তালিকা | ১৯৫-১৯৬ |

Dhaka University Institutional Repository


| | | |
|---|---|---|
| | গ. উৎস | ১৯৭-১৯৮ |

# কৃতজ্ঞতাস্বীকার

এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রথমে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন প্রতি, তাঁর দিক নির্দেশনায় আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে পেরেছি। গবেণার পরামর্শ নির্ধারণ এবং ঐতিহাসিক ও মৌখিক পদ্ধতি কীভাবে কাজ করা যায় সে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি একজন আদর্শ অভিভাবকের মতো আমাক সহযোগিতা করেছেন, গবেষনার প্রতিটি পর্যায়ে। তাঁর পথনির্দেশনায় গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমি তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল ও অধ্যাপক ড. . রাজা রাজ্জাক আহসানের প্রতি। তাঁদের সহযোগিতা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমার মা হোসনেয়ারা ইদরিস মুক্তা, আমার সবচেয়ে অনুপ্রেরণা। তিনি সব সময় আমাকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন পড়াশোনার বিষয়ে। মায়ের অনুপ্রেরণায় আমাকে সাহস যোগায় সবসময়। আমার স্বামী মো. সাইফুল ইসলামের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া আমি এ গবেষণা কর্মটি কিছুতেই হয়তো সম্পন্ন করতে পারতাম না। পড়াশোনা ও গবেষনার বিষয়ে আমাকে অনুপ্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছেন আমার শাশুড়ি সালেহা ইসলাম, আমার বড় বোন ড. মাহমুদা পারভীন ও ছোট বোন ইসবা ফারহীন। আমার একমাত্র ভাই এম. এইচ. অনুপম মাহমুদ রুবেল আমার সাথে ভাটি এলাকাগুলোতে গিয়েছে, তথ্য সংগ্রহে আমাকে সহযোগিতাও করেছে ব্যাপকভাবে।আমার পুত্র কিংশুক এবং কন্যা কিন্নরী আমার অন্যতম অনুপ্রেরণা।আমি আন্তরিকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার আইন পেশায় সিনিয়র এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেনের প্রতি।আমি কৃতজ্ঞ সকল সহযোগীগণের প্রতি যারা আমার গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করেছেন, আমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমি ছোট ভাই খায়রুল আলম বাদল এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মো: আখতারুজ্জামান, নুর এ আলম ও জগদীশ চন্দ্র রায়-এর সহযোগীতার জন্য।সবশেষে ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় কাজে সার্বিক সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিভাগীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা নূরুল ইসলাম ও মাসুদুর রহমানকে।

Dhaka University Institutional Repository

## ভূমিকা:

ধারণা করা হয় বাংলাদেশের পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলোতেই কৃষির আবির্ভাব আর পূর্ব দিকের এই অঞ্চলগুলোতেই বছরে চার থেকে ছয় মাস বর্ষার পানি থাকে। হাওর অধ্যুষিত এই এলাকাগুলোতে পলি মাটি জমে শুকনো মৌসুমে ফসলের ফলন বাড়িয়ে দেয়। ভাটি অঞ্চলগুলোতে তাই বছরে এক ফসলই হয়। ভাটিঅঞ্চল বলতে মূলত বুঝায়, যে অঞ্চলে বছরে ছ'মাস পানি ও বাকি ছ'মাস শুকনো থাকে। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই সাতটি জেলার ৪০টি উপজেলা জুড়েই ভাটি অঞ্চল বিস্তৃত। পুরো ভাটি অঞ্চল জুড়ে সুতোর মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য হাওর, খাল-বিল, নদী-নালা। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য এখানে বিরাজমান। সহজ সরল প্রাণবন্ত এখানকার বাসিন্দা।

ভাটি অঞ্চলের মানুষের মূল পেশা কৃষি। কেউ কেউ আবার ব্যবসাও করেন। সওদাগর শ্রেণীর যারা আছেন তাদের মূল ব্যবসা চলে নৌকার উপর ভর করে। কিন্তু বর্ষার মৌসুমে এই কৃষক শ্রেণীই নৌকা নিয়ে মাছ শিকারে  নেমে যায়। ভাটি অঞ্চলের মানুষের মূল পোশাক হলো লুঙ্গী আর গেঞ্জী তবে অবস্থাসম্পন্ন মহাজনশ্রেণীর লোকজন লুঙ্গীর সাথে ফতুয়া বা পাঞ্জাবীও পরিধান করেন। ভাটি অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে মাছ আর ভাতের প্রাধানই বেশি তবে সেটা অব্যস্থা সম্পন্নদের বেলায় বেশী প্রযোজ্য। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুড়ায়

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কোন রকম শাক ভাতেই দিন কাটে। তবে ভাটির মানুষের অন্তর বানের জলের মতোই নির্মল আর পরিচ্ছন্ন। শিক্ষার অভাব থাকলেও নৈতিকতার অভাব সে অর্থে নেই। বিশ্ব নন্দিত গণসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং বাংলাদেশের অমর কথাশিল্পী হুমায়ুন আহমেদ ভাটি অঞ্চলের সন্তান। ক্ষনজন্মা ব্যক্তিত্ব হুমায়ুন আহমেদের লেখা, গানে ও চলচিত্রে ভাটি অঞ্চলের অন্তর 'বাহিরানা' হিসেবে উঠে এসেছে।

ভাটি অঞ্চলের সংস্কৃতি অত্যন্ত বিচিত্র ও বর্ণিল। তাই ভাটি অঞ্চলের গানগুলোও অত্যন্ত সহজ, সরল, বিচিত্র ও বর্ণিল। এক ফসলী এ সমস্ত অঞ্চলে শুকনোর সময় ফসল ফলাতে কৃষকের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটতে হয়, দম ফেলারও যেন সময় নেই। ফসল ঘরে তোলা হয়ে গেলে শুরু হয় বর্ষা, খাল-বিল ক্ষেত খামারে পানি থৈ থৈ করতে থাকে। তখন কৃষকের সে অর্থে কোনো কাজই থাকে না। অনেকে নৌকা নিয়ে বের হয়ে যায় মাছ ধরতে প্রবল বর্ষার মাঝেই। আর এই বর্ষার সৌন্দর্যে মনের আবেগে তারা গেয়ে যায় সুরেলা কোন গান। এসব গান মানুষকে নিয়ে যায় তার আত্মার কাছে। এসব গানে থাকে প্রেম, বিরহ, স্রষ্টাভক্তি, গুরু-বন্দনা, নারীর আকুতি। আর এই গান গুলোকেই আমরা ভাটি অঞ্চলের গান বলে থাকি।

Dhaka University Institutional Repository

ভাটি অঞ্চলের এই গানগুলোই সেসব অঞ্চলের ঐতিহ্যের উপাদান। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ও বর্ষার পানিতে থৈ থৈ করে ভাটি অঞ্চলগুলো বর্ষার সময়ে। এই অঞ্চলগুলোর পরতে পরতে জড়িয়ে আছে যাত্রাগান, পালাগান, বাউলগান, গাজীর গান, কীর্তন, ভাটিয়ালী, ধামাইল, বারোমাসী গান, মেয়েলী গান, সূর্যরথের গান। বর্ষার সময় এই ভাটির গ্রামগুলোকে মনে হয় যেন এক একটি দ্বীপ। আর এই সময় গান পাগল ভাটির মানুষগুলো বিভিন্ন সুরে গান বাঁধেন। ভাটির এই অঞ্চল গুলোতে বার মাসে তের পার্বন লেগেই থাকে। বর্ষার সময় কৃষকেরা যখন মাছ ধরতে বের হয় ভোর বেলায়, নৌকায় বসে জাল ফেলে বসে থেকে গুন গুন করে গেয়ে উঠে ভাটিয়ালী, বাউল, মুর্শিদী ইত্যাদি নানা আঙ্গিকের গান। যুগে-যুগে, কালে-কালে, মুখে-মুখে ফিরছে রাধা রমন, প্রতাপ রঞ্জন তালুকদারের লেখা সেই ধামাইল গান। ধামাইল গান ভাটি অঞ্চলের সংস্কৃতির অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। ধামাইল গান হিন্দু-মুসলিম সব বিয়েতেই গাওয়া হয়। ভাটি অঞ্চলের নারীদের মুখে-মুখে ফিরছে এই ধামাইল গান বহু বছর ধরে। আর এসব ধামাইল গানের সুর অবলম্বন করে হেমাঙ্গ বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন কয়েকটি কালজয়ী গণসঙ্গীত।

ভাটি অঞ্চল এর মানুষগুলোর অন্যতম পেশা হল কৃষি ও মৎস্য শিকার। তাই সারাদিন তাদেরকে পেশাগত কারণে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়। আর সন্ধ্যা-রাতটুকু তাদের কাছে বিনোদনের সময়। আর

Dhaka University Institutional Repository

সে সময়ই তারা গান বাজনায় মেতে উঠে। মহররম, দোলযাত্রা, বিয়ে, শ্যামা পূঁজা ও ধর্মীয় উৎসবে তাদের গানই মূল আকর্ষণ। শরতে আসে দূর্গা পূজা, সেখানে চলে কীর্তন। প্রতিটি পার্বণই ভাটি অঞ্চলের মানুষের কাছে বিনোদন হিসেবে বিবেচিত। আর এই বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হল ভাটি অঞ্চলের গান। সমাজের প্রতিচ্ছবি এই গানগুলো। ধামাইল গান ভাটি অঞ্চলের নারীদের এতোই প্রিয় যে-এই গানগুলো গাওয়ার সময় তারা দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্ট কিছুটা হলেও ভুলে থাকেন। আর এই গানগুলো মা-ঠাকুমা বা দিদিমা গাইতেন আর তা-ই এখনো গাওয়া হচ্ছে। দরিদ্র কৃষক, মাঝি, জেলে ও রাখালেরা তাদের বাবা-দাদাদের কাছে থেকে এসব ভাটিয়ালী গান রপ্ত করে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

বাংলার বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা-আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে এই ভাটি অঞ্চলের গানগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। নারী-পুরুষের ভেতরকার অন্তহীন বেদনা, আনন্দ, বিরহ, প্রেম ইত্যাদি স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় এসব ভাটি অঞ্চলের গানে। আর আমরা সেখান থেকেই উৎঘাটন করতে পারি ভাটি অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এসব গান কতটুকু ভূমিকা রেখেছিল এসব খুঁজে বের করাই আমার গবেষণার

Dhaka University Institutional Repository

মূল লক্ষ্য। কালের আবর্তে এই গানগুলোর মূল ভাবমূর্তি নষ্ট হতে চলেছে।

যন্ত্রের আওয়াজের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে এই গানের সুর। কেউ কেউ বিকৃত করে ফেলছে। মাছ ধরার সেই নৌকাগুলোতে লাগানো হচ্ছে ইঞ্জিন, ইঞ্জিনের শব্দে জেলের কণ্ঠ দিয়ে আর বের হয় না সেই দরদি গান। স্যাটেলাইটের এ যুগে দরদি এই গ্রামের শিল্পীদের কদর কমে আসছে। গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরেই এখন ঢুকে গেছে ডিশএন্টেনার সংযোগ। এর ফলে শুধু ভাটিয়ালী শিল্পীদের হাহাকারই চোখে পড়ে। কেউ আর তাদের ডাকে না, গ্রামের বিয়েতে বা সৌখিন মহাজনের বাড়ির উঠানে গান গাওয়ার জন্য। এ বিষয়ে শাহ আবদুল করিমের 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম' এই গানটির মাধ্যমেই বোঝা যায় পরিবর্তনের অনেকটাই।

ভাটি অধ্যুষিত এ সমস্ত অঞ্চলের গানগুলো পল্লি সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। এই অঞ্চলের মানুষের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহ-মিলন, আধ্যাত্মিকতা, দেহতত্ত্ব বিষয়ের ব্যাপক প্রতিফলন ঘটে এই গানের কথায়। কী চমৎকার ছিল সেই দিনগুলো। খুন-রাহাজানি তখন ততটা ছিলনা, এখন যেমন অস্থির এই সমাজের চিত্র আমরা প্রতি নিয়তই দেখছি। শান্ত সুনিবিড় সেই ভাটির গ্রামগুলো আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রচিত সেই গানগুলোর প্রভাবেই সামাজটা খুব

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দর ছিলো। সুন্দর ছিলো মানুষের সেই কোমল মনোবৃত্তি। গানের কথা ছিলো  খুব-ভারি এবং অর্থবহ। এখানকার দিনের মতো এমন হালকা ও চটুল গান তখন ছিলো না। মানুষের ভাবনার গভীরতা বিশেষ করে ভাটির গানগুলোর রচিয়তাদের চিন্তার গভীরতা অনুভব করা যায় তাদের গানগুলো শুনে।

শাহ আব্দুল করিম, বিরহী উকিল মুন্সী, আব্দুস সাত্তার, দীন-ভবানন্দ, সৈয়দ শাহনুর, রাধা রমন, কালাশাহ, রশিদ উদ্দিন, কামাল উদ্দিন, দূর্বীন শাহ, শচীনদেব বর্মণ, হেমাঙ্গবিশ্বাসসহ নাম না জানা আরো অনেক গুণী শিল্পীগণের গানের গভীরতাতেই আমরা তখনকার সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র অনুভব করতে পারি। আর এই সাধক পুরুষদের জীবনচরিত ও তাদের অপ্রকাশিত গানগুলো খুজেঁ বের করে আনতে হবে।

ভাটির গানের সাথে যে একতারা, দোতারার ব্যবহার ছিল তা হারিয়েই যাচ্ছে। এটা একটা উদ্বেগের বিষয়। ঘাটু গান হারিয়েছে সেই কবেই। উড়ি গান, গাজীর গান, মালজোড়া এখন আর কেউ গায়ই না। মোবাইল ও তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে এখন আর কেউ এসব বাউল শিল্পীদের মুখে ভাটির গান শুনতে চায় না। বায়না করে যারা গান গাইতো এখন তাদের জীবিকার পথ বন্ধ, শোচনীয় তাদের জীবন-যাপন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, রমেশ রায়, প্রাণেশ দাসদের মতো সুরকারও গীতিকারদের উত্তরসূরীগণ কোথায়। অথচ অসংখ্য

বিচিত্র গানের উৎপত্তি ও বিকাশ বাংলাদেশের এই ভাটি অঞ্চলেই। ভাটির এই সমস্ত গুণী শিল্পীদের গান সংগ্রহ করে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সে সব গানের ভূমিকা কী ছিল তা তুলে ধরাই গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য।

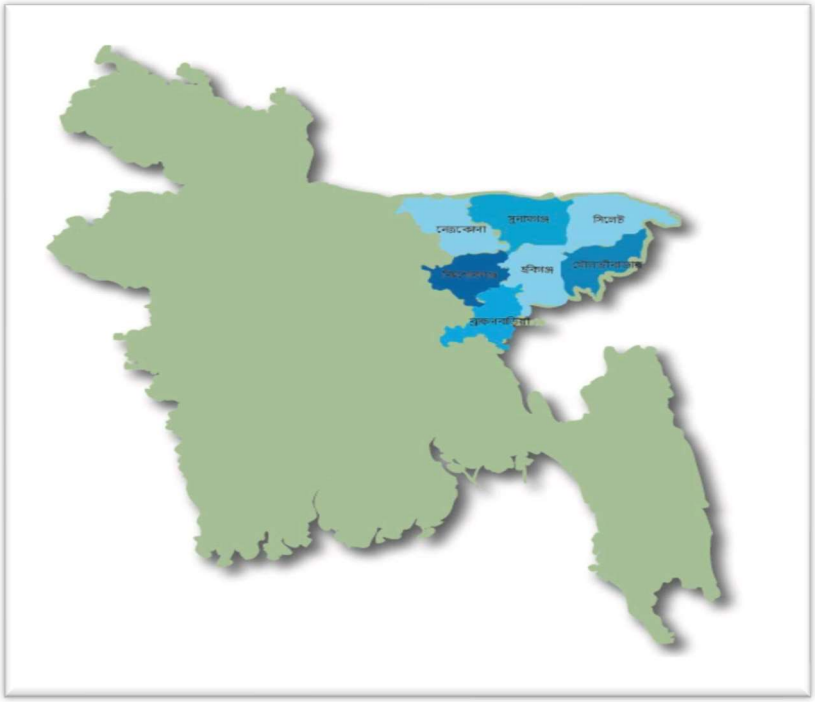

**বাংলাদেশের মানচিত্রে ভাটি অধ্যুষিত জেলা সমূহের অবস্থান**

**প্রকাশনা পর্যালোচনা:**

বাংলাদেশের প্রায় প্রতি জেলার এমনকি উপজেলারও ইতিহাসভিত্তিক প্রচুর প্রকাশনা রয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে অনেক সময় এর মধ্যে সে সব অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এর মাঝে সে সব অঞ্চলের আঞ্চলিক গান এর বিষয় গুলোও উঠে এসেছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ এর উপর ভিত্তি করে অনেক ইতিহাসভিত্তিক প্রকাশনা থাকলেও এর মাঝে এ অঞ্চলের গানের ইতিহাস পর্যালোচনাটি খুব কম পরিসরে এসেছে। বৃহত্তর সিলেট বিভাগের ইতিহাস পর্যালোচনা ভিত্তিক প্রকাশনাতে ও ভাটির গানের **ওপ**র আলোচনা খুবই কম। ব্রাহ্মবাড়িয়ার ইতাহাস ভিত্তিক প্রকাশনাতেও ভাটির গানের আলোচনায় তেমন কোনো ব্যাপকতা পাওয়া যায়নি। শুধু মাত্র ভাটি অঞ্চলের গানের ওপর আলাদা করে কোনো প্রকাশানা চোখে পড়ে না। যা এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠক সমাজকে নিরাশ করে।

কেদারনাথ মজুমদার, হরচন্দ্র চৌধুরী ও শৌরীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এঁদের লেখা ইতিহাস সংগ্রহ করে কমল চৌধুরীর গ্রন্থণায় প্রকাশিত অন্যতম প্রকাশনা হল: ময়মনসিংহের ইতিহাস । এখানে শুধুমাত্র বৃহত্তর ময়মনসিংহের ও শেরপুরের বিভিন্ন ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা চোখে পড়ে। তাও এই গ্রন্থটি  প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার ‘দেজ পাবলিশিং’ থেকে। অর্থাৎ বাংলাদেশে ভাটির  অঞ্চলের গানের ওপর আলাদা কোনো প্রকাশনা নেই বললেই চলে।

ভাটি অঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে লোকসংস্কৃতির স্বর্ণখনি লুকিয়ে আছে বৃহত্তর ময়মনসিংহেই বেশি । সংস্কৃতির এতো বৈচিত্রতা বাংলাদেশের

অন্য কোন জেলাতে খুব কমই আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের জমিদারগণ অনেক পৃষ্ঠপোষকতা করতেন সংস্কৃতির উন্নয়নে। কিছু কিছু ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থে এসব তথ্য উল্লেখ আছে, আবার বেশির ভাগ সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং কোন প্রেক্ষাপটে এগুলো রচিত হয়েছে তা অগ্রন্থিতই থেকে গেছে বেশি। সে কারণেও এ বিষয়ে গবেষণা করার তাগিদ বোধ করেছি বেশি।

গুঁটি কয়েক নিরলস পরিশ্রমী গবেষকের গবেষণা কর্মের জন্যই আমরা ভাটি অঞ্চলের ইতিহাস বহুলাংশে জানতে পেরেছি, যা আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ।

*ময়মনসিংহের ইতিহাস* গ্রন্থটিতে চন্দ্রকুমারদে[১] নামে এক দরিদ্র যুবকের কথা এসেছে। শুরুতেই পালাগান সংগ্রহে যার অসামান্য অবদানের কথা বলা হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই দরিদ্র যুবক পালাগান সংগ্রহ করেছেন। 'সৌরভ' নামক একটি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশ হলে পুরো সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। এরপর পালাগান নিয়ে আর বিশেষ কোন লেখা লেখি হয়নি।

---

১.কমল চৌধুরী (সম্পা.); *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, (কলকাতা: দেজ, ২০০৫), পৃষ্ঠা: ভূমিকা অংশে দ্রষ্টব্য।

চন্দ্র কুমার দে'র অপ্রকাশিত লেখাগুলো আর প্রকাশিত হয়নি। এমন আরো অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে ভাটির আনাচে-কানাচে। এসব

প্রতিভা খুঁজে বের করে, তাদের অপ্রকাশিত গানগুলো প্রকাশ করার উদ্যোগ নিতে হবে। অঞ্চল বা জেলা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক প্রকাশনা থাকলেও পুরো ভাটি অঞ্চলকে একত্রে গেঁথে কোন প্রকাশনা খুজেঁ পাওয়া যায় না। ভাটি অঞ্চলের  অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে যুগে-যুগে যে গানগুলি রচিত হয়েছে, তার একটা সামগ্রিক প্রকাশনার প্রয়োজন। চন্দ্রকুমার দে'র মতো গুণী গীতিকার গণের গানগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লষণ করে উপস্থাপনের জন্য গবেষনা প্রয়োজন। পুরো ভাটি অঞ্চল জুড়ে যে সব গুণিজন অমর গান রচনা  করে গেছেন, তাদের নাম গুলো যেন হারিয়ে না যায়, সে তাগিদ থেকেও গান গুলো সংগ্রহ করে প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনে নিজের সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো পুরো জাতি। শিকড়হীন প্রজন্ম তৈরি হবে।

ভাটি অঞ্চলের ইতিহাস নানা ঘটনাপূর্ণ। প্রাকৃতিক বৈচিত্রমন্ডিত ভাটির জেলাগুলোর সৌন্দর্যই সেখানাকার সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায়ও ভাটির সংস্কৃতি সমাদৃত। এখনো অনেক কাব্য সাহিত্য হয়তো মুদ্রণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যা আমরা ভাটি অঞ্চলের অধিবাসী হয়েও জানতে পারিনি। এমন ইতিহাসগুলো যদি আমরা পুনরুদ্ধারের তাগিদে গবেষণা করি তাহলে অনেক প্রকাশনা প্রকাশিত হবে এবং সেখান থেকে আমরা জানতে পারবো তৎকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি কেমন ছিলো।

**তাত্ত্বিক কাঠামো:**

পল্লি সাংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন এই গানগুলোতে ভাটির মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ বিরহ মিলন সব কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। স্যাটেলাইট ও বহুমাত্রিক মিডিয়ার জোয়ারে এখন এই গান গুলোই বিকৃত ভাবে গাওয়া হয়। কালের বিবর্তনে এসব গান হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত এই গানগুলোর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। তাই এসব গানের উপর গবেষণা হওয়া খুব প্রয়োজন। লালন ফকিরের গানের সাথে ভাটির গানের অনেকখানি যোগসূত্র রয়েছে। বাউলদের সাধনা মূলত গুরুকেন্দ্রিক সাধনা। বাউলের পথচলা খুব সহজ ও সরল, ঠিক ভাটির অঞ্চলের গানের রচিয়তাদের মতো তাদের জীবন সাধারণ ও বর্ণহীন । লালন তাঁর গানে কোথাও তাঁর জাত বা সম্প্রদায়ের সম্পর্কে কিছু বলেননি । তার ধর্মটাকে আড়ালে রেখেছেন। মানুষের মাঝেই তিনি সব পেয়েছেন।

মানুষ ভজলে, সোনার মানুষ পাবি[২] - তার এই গানের কলিতেই আমরা এই কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারি। তিনি আরো বলেছেন, “এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে যেদিন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতিগোত্র নাহি রবে”। অর্থাৎ তিনি এক সমাজের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁর  এই গানের সাথে শাহ আবদুল করিমের: “আগে কি সুন্দর দিন

কাটাইতাম” গানটির যথার্থ মিল রয়েছে। আর এই তথ্যগুলো খুঁজে বের করে আনার জন্যই ভাটির অঞ্চলের গানের ওপর আমার এই গবেষণা। ভাটি অঞ্চলের গানগুলোর ওপর গবেষণা হলে এই গানগুলো সংরক্ষিত হবে। টিকে থাকবে কাল নিরবধি। এই তাগিদ থেকে ভাটি অঞ্চলের গানের ওপর আমার এই গবেষণার উদ্যোগ।

একটি সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার অন্যতম উৎস হলো সে সমাজের ওপর লিখিত কোনো গ্রন্থ পাঠ করা অথবা সরেজমিনে সে অঞ্চলের ইতিহাস জানার উদ্দেশ্যে গবেষণা করা। আর শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিকা অপরিসীম। ভাটি অঞ্চলের গানগুলো সে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি।

---

২.আবদুল ওয়াহাব; *বাংলাদেশের লোকগীতি-একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন;* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৭) পৃ: ২৯৫

**গবেষণা পদ্ধতি:**

আমার সমগ্র গবেষণাটিকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। এখানে মূলত ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশ শতকের সমাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে সংশিষ্ট ব্যক্তিগণের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। ধাপগুলো নিম্নরুপ:

১। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ:

আমার গবেষণার সবচেয়ে বড় অভাব ছিলো তথ্যের। কারণ ভাটি অঞ্চলের গানের ওপর আলাদা করে কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি বা রচিত হয়নি। প্রাথমিক সূত্র হিসাবে ভাটি অঞ্চলগুলোর ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। দ্বৈতয়িক সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত গবেষণামূলক কিছু প্রবন্ধ ও ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য।

২। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ:

ভাটি অঞ্চলের গানের রচয়িতা ও সুরকারগণের মধ্যে এখনো যারা জীবিত ও প্রসিদ্ধ তাদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান সময়কার আঞ্চলিক কয়েকজন শিল্পীর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে আমার এই গবেষণায়। প্রকাশনাটি তাদের সাক্ষাৎকারের নমুনা সংযোজন করা হয়েছে। আমার গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ের মাঝে ভাটি অঞ্চলের গানের রচিয়তাগণের পরিচয় ও তাঁদের গান এবং কয়েকজনের সাক্ষাৎকার ও মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

৩। মাঠ পর্যায়ের সাধারণ পাঠক ও সমঝদারগণের মতামত গ্রহণ:

গবেষণার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের পাঠকগণের মতামত ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে পাঠক বলতে ভাটির গানের গবেষণায়

আগ্রহী ও ভাটির গানের গায়ক এবং শ্রোতাগণকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে বিদগ্ধ মহলের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

৪। সংগৃহিত তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষাৎকার ও মতামত বিশ্লেষণ:

সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তার সাথে প্রাথমিক তথ্যসূমহের যাচাই-বাচাই করা হয়েছে। এই তথ্যগুলো দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভিতর ব্যবহার করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৫। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবনা আকারে উপস্থাপনা:

প্রাথমিক সূত্র হিসাবে যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে তার সাথে মাঠ পর্যাযের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকার ও মতামত এর যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। এই গবেষণা কাজের শেষে সব অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সমন্বয়ে একটি সিন্ধান্তে উপনিত হওয়া সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ভাটি অঞ্চল গুলোর উপর ইতিহাসভিত্তিক কিছু প্রকাশনা রয়েছে। যেখানে ভাটির গানের ওপর আলোচনা নেই বললেই চলে। ভাটি অঞ্চলের গানের ওপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বা পর্যালোচনার বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভাটির গানগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আর গবেষণার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে:-

১ । বিশ শতকের সমাজ ও রাজনীতিতে এবং সংস্কৃতিতে ভাটির গানের প্রভাব কতটুকু?

২। লালনের গানে সাথে  ভাটির গানের তুলনা বা যোগসূত্র কতটুকু ?

৩। ভাটি অঞ্চলের গানগুলো সংরক্ষণের উপায় কী?

বিশ শতকের সমাজ রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে ভাটির গানের কী প্রভাব ছিলো, এ বিষয় প্রচুর তথ্য শূন্যতা রয়েছে। এই তথ্য শূন্যতা কিভাবে পূরণ করা যায় এ বিষয়ে আমার গবেষণায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ জন্য নানা সূত্রের সন্ধান ও সাহায্য নেয়া হয়েছে। গবেষণার বিষয় হিসাবে গান এখনো অনেকটা উপেক্ষিত। আর তার ওপর ভাটির গান তো আরো অবহেলিত। তাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ভাটির গান ও এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট খুঁজে বের করা ও লালনের গানের সাথে এর যোগসূত্র আছে কী না তা খুঁজে বের করা।

কবিতা, গান, সাহিত্যই হলো মূলত সমাজের প্রতিচ্ছবি। সামাজিক অবয়ব কোন অঞ্চলে কেমন তার সবটুকু প্রতিফলন দেখা যায় সে অঞ্চলের গান তথা সাহিত্যে। আমাদের দেশে লোকসংগীতের একটি অংশ মনে করা হয় ভাটির গানকে। তবে বিশ শতকেও এই গানগুলোর রচয়িতাগণ আঞ্চলিক ভাষায়ই গানগুলো রচনা করতেন। কিন্তু বিশ শতকের শেষের দিকে লোক সংগীতে আঞ্চলিক ভাষার স্থান ছিলো না। ত্রিশের দশকে ভাওয়াইয়া গানের প্রবাদ পুরুষ আব্বাস উদ্দিন তাঁর

**"ন**দীর নাম সই কচুয়া, মাছ মারো মাছুয়া"[৩] এই গানটি রেকর্ড করতে গেলে তখন রেকর্ড কোম্পানির কর্তারা কিছুতেই এই ইতর ভাষায় গান রেকর্ড করতে রাজি হননি অবশেষে তিনি সুর ঠিক রেখে কাজী নজরুল ইসলামের সহায়তায় এই গানটি ভদ্র ভাষায় রুপান্তর করলেন-

---

৩.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সংগ্রহ-১*; (কলকাতা; দে'জ; ২০১২) পৃষ্ঠা-২৭৭

'নদীর নামটি অঞ্জনা নাচে তীরে খঞ্জনা'। তারপর এটি রেকর্ড হলো। আমরা এই তথ্য পাই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের রচনা সংগ্রহে বইটি থেকে। তখন থেকেই আব্বাস উদ্দিন সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন আঞ্চলিক গান আঞ্চলিক ভাষাতেই রচনার জন্য। আর তার প্রতিফলন ঘটলো

১। 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে'

২। 'ওকি গাড়িয়াল ভাই',

এই গান দুটি রেকর্ড হওয়ার পর থেকেই ভাটির গানগুলো রচিত হয় ভাটি অঞ্চলের ভাষাতেই। ভাটির গানের আরেক প্রবাদ পুরুষ শচীন দেব বর্মণ ও তার প্রথম রেকর্ড বের করেন আঞ্চলিক ভাষার গানের তাঁর একটি গান হলঃ

'ডাকলে  কোকিল রোজ বিহানে
মাঠের বাটে যাই
আকাশ তখন উষার বিছায়
সিদুঁর মাথা তাই'।

এই গানটি গাইলেন শচীন দেব বর্মণ আর এর রচয়িতা হেমেন্দ্র কুমার রায় । এর পর থেকেই আঞ্চলিক ভাষায় এই গানগুলো গাওয়ার জোয়ার শুরু হয় বিভিন্ন জেলায়।গানে আঞ্চলিকতার বহিঃপ্রকাশ সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকেই সংগৃহিত। এসব আঞ্চলিক গানই পরবর্তীতে সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে। ঠিক তেমনি ভাটি অঞ্চলের গানগুলো তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কী ভূমিকা রেখেছে তার পর্যালোচনা করাই আমার এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। ভাটির প্রতিটি গ্রামে আগে গায়েন, বায়েন ও পেশাদার শিল্পী ছিলো। সমাজ অভাব অনুযোগও ছিলো। বিভিন্ন গানের কথায় এই অভাবের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই। যেমন;

কি কম্ম করলাম রে ভাই গাজীর গীত গাইয়া
পাঁচ আনা রুজি করলাম পাঁচ সিকার পাইয়া।[৪]

এই গানে ভাটি অঞ্চলের মানুষের আর্থিক সংকটের কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তবুও মানুষ অভাবের মাঝে তাদের নৈতিকতার কালিমা লাগতে দিতো না। তৎকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতির হালচাল আরো স্পষ্টভাবে জানার উদ্দেশ্যেই আমার এই গবেষণা প্রয়াস।

---

৪.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সংগ্রহ-১*; (কলকাতা; দে'জ; ২০১২) পৃষ্ঠা-২২৬

## অধ্যায় বিভাজন:

মূল আলোচনা: ভাটি অঞ্চলের গান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা (২০ শতক)। অর্থাৎ ভাটি অঞ্চলের গান গুলোতে আমরা বিশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কী আবাহ খুজেঁ পাই বা ভাটির গান গুলো সমাজ ও সংস্কৃতিতে কী ভূমিকা রেখেছে এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে আমার গবেষণা কর্মটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে। যথা:

অধ্যায় ১: ভাটি অঞ্চলের গান বলতে কী বোঝায়?

অধ্যায়-২: ভাটি অঞ্চলের গান: ঐতিহাসিক পটভূমি, পরিচিতি ও পরিবেশন রীতি।

অধ্যায়-৩: বিনোদনের প্রধান ধারা হিসেবে ভাটি অঞ্চলের গান ।

অধ্যায়-৪: ভাটি অঞ্চলের গানে আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ব।

অধ্যায়-৫: লালনের গানের সাথে ভাটি অঞ্চলের গানের যোগসূত্র।

অধ্যায়-৬: ভাটি অঞ্চলের গানে কী পরিবর্তন এসেছে ও করণীয়।

অধ্যায়-৭: ভাটি অঞ্চলের গানগুলোকে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

প্রথম অধ্যায়:

## ভাটি অঞ্চলের গান বলতে কী বোঝায়?

সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই সাতটি জেলার ৪০টি উপজেলা জুড়ে মূলত ভাটি অঞ্চল বিস্তৃত । এসব অঞ্চলের ভূমি বছরে ছ'মাস শুকনো থাকে আর বাকী ছ'মাস থাকে অথৈ পানিতে ভরপুর। ভাটি অঞ্চল গুলোতে আছে অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা। ভাটির এই অঞ্চলগুলোতে বন্যার সময় মানুষের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত পানি চলে আসে। বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষের জায়গা গুলোও তখন কানায় কানায় পূর্ণ হয় পানিতে।

কৃষক যখন বৈশাখ মাসে ফসল ঘরে উঠিয়ে ফেলে তখন প্রবল বর্ষণে গ্রীষ্মকাল শেষ হতে না হতেই বানের পানি আসতে থাকে। কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় পুকুর, খাল-বিল,নদী-নালা। তখন কৃষকের হাতে কোনো কাজ থাকে না। আর তখন গান পাগল ভাটির মানুষগুলো গান বাঁধেন বিভিন্ন সুরে। জেলেরা এসময় মাছ ধরাতে ব্যস্ত সময় পার করলেও মুখে তাদের সুরের রেশ লেগেই থাকে জাল ফেলে দিয়ে গান গাইতে থাকে। বর্ষাকালের এই সময়টুকুতে বিয়ে সাদীর একটা তোড়জোর শুরু হয়ে যায়। বরযাত্রীরা যাত্রা করে নৌকা নিয়ে। গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে 'বৌভাত' ও 'ফিরা যাত্রা' (কনেকে নিয়ে বর যখন বৌভাতের পর শ্বশুড়বাড়ী অর্থাৎ কনের পিত্রালয়ে বেড়াতে আসা) পর্যন্ত সকল অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় গান। আর এই গানগুলোকেই বলা হয় ভাটি অঞ্চলের গান।

ভাটির গানগুলোর মধ্যে অন্যতম হল যাত্রাগান, পালাগান, বাউলগান, কীর্তন, গাজীর গান, ধামাইল, মেয়েলী গান, বারোমাসী গান, সূর্যরথের গান ইত্যাদি। বাঙালি সমাজে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। আর এই পার্বণর অন্যতম এই গান নারীরাই বেশি গাইতো। ভাটি অঞ্চলের বিনোদনের অন্যতম অনুষঙ্গ হল ভাটির গান। হেমন্তের গান হল ধামাইল। বিয়েতেও ধামাইল গাওয়া হয়। এই গানগুলোর মধ্যেই বাংলার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেক্ষাপটে খুঁজে পাওয়া যাবে। এসব গানের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গঁ। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে ভাটির এই গানগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ভাটি অধ্যুষিত এই সাত জেলার অন্যতম জেলা হল কিশোরগঞ্জ। এই কিশোরগঞ্জ জেলার অন্যতম ভাটির গান হল:

**শিব সংগীত[৫] :** প্রাচীন বাংলার প্রিয় দেবতা ছিলেন শিব। শিব এর বন্দনা করতে এই শিব সংগীত গাওয়া হতো। ভক্তকূলের মুখে মুখে থাকতো শিব সংগীত । বর্তমানে শিব সংগীতের প্রচলন কমে যাচ্ছে ।

---

৫.কমল চৌধুরী (সম্পা); *ময়মনসিংহের ইতিহাস,* (কলকাতা: দেজ, ২০০৫), পৃষ্ঠা: ৮৯

তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে এই শিব সংগীতে। বিয়ের সময় বর-কনেকে শিব ও উমার সাথে তুলনা করা হতো। স্বামী-স্ত্রীর প্রগাঢ় ভালোবাসা ও একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা তৎকালীন

সমাজের এই প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে এই শিব সংগীতে। কিশোরগঞ্জের অন্যতম একটি শিব সংগীত হল:

সাজ শীঘ্রকরি যাইতে হবে
গিরিরাজ ভবনে
আন যাঘারম্বর দেও সত্তর পরণে
আন সিদ্দের ঝুলি ভাস্মরুলি
মাখিব বদনে।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রায় প্রতিটি ভাটির জেলাতেই বিভিন্ন গীত গাওয়া হতো। সন্ধ্যায় গ্রাম্য নারীগণ গাইতেন:

তুমি গেলে বন্ধু দ্বারা ছাইরা তো দিব না
গুমাইয়াছে গো আমার রাই কাঁচা সোনা।

ভাটির গানগুলোর মধ্যে অন্যতম আরো এক প্রকারের গান হল কার্তিক সংগীত। কার্তিক সংগীতগুলো বাঙলা কার্তিক মাসের বিভিন্ন পার্বণে গাওয়া হতো। এই গানগুলো উৎসর্গ করা হতো কার্তিক দেবতাকে। কার্তিক সংগীতের একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো:

বুলেরে কার্তিক জাইবাইন শ্বশুরবাড়ী

আলুয়া চাইলে খেসারির ডাইলে সঞ্জনবালা।

এই কার্তিক সংগীতগুলো অনেক পুরাতন। সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত ভাটিয়ালি গানগুলো এখনো গ্রামাঞ্চালে গাওয়া হয়। সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষপটেই এই গান গুলো লেখা হয়েছে ও গাওয়া হয়েছে।

ভাটি অঞ্চলের অন্যতম প্রিয় একটি সংগীত হল বাউল সংগীত[৬]। বাউল লালন শাহ, দুদ্দু শাহ ও দুর্বিন শাহ এর কিছু গানে তখনকার সমাজের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে ভাটির পুরুষ দুর্বিন শাহ'র একটি বাউল সংগীত তুলে ধরা হলো:

নামাজ আমি পড়তে পারলাম না।
দারুণ খান্যাসের দায়
নামাজ আমার হইল না আদায়।।
ছিলাম আমি গোয়াইল ঘরে। হাউর থিক্যা আইলনা গাই
বাছুর আমার বান্ধা নাই।।
মাগরিবের নামাজ কালে
বিবি কহেন চাল ফুরাইছে
ছেইলা -মাইয়ার কান্দন শুইনা
কান্দে পাগল দুর্বিন সাঁই।

এই গানের মাধ্যামে আমরা তৎকালীন সমাজের চিত্র খুঁজে পাই-নামাজ না পড়ার পেছনে তাঁর বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করানো হয়েছে। অভাব অনটন পূর্ণ ভাটির সমাজের সর্বত্রই এই চিত্র খুঁজে পাওয়া যেতো। ভাটি অঞ্চলের এই সৃজনশীল মানুষগুলো তাদের জীবন ও জীবিকার কথা তুলে ধরেছেন গানে গানে। এখানে অভাবে**র** প্রসঙ্গ এসেছে। বাঙলার বাউলগণ ছিলেন প্রত্যক্ষ বাদী। অনুমানের চেয়ে জীবন দর্শনকেই বেশী প্রধান্য দিয়ে গান রচনা করেছেন। ধর্মকে উপেক্ষা করে মানবতাবাদকে প্রধান্য দিয়েছেন গানে । জাত পাতের **ঘো**র বিরোধী ছিলেন বাউল গানের প্রণেতাগণ। তাইতো  লালন বলেছেন-

জাত গেলো জাত গেলো বলে
একি আজব কার খানা
সত্য পথে কেউ নয় রাজী
সবই দেখি তা-না-না।

---

৬.শামছুজ্জামান খান (সম্পা); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, নেত্রকোনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩), পৃষ্ঠা: ১৪৫

বিশ্বজনীন মানবতা বোধ ছিলো বাউল গানের অন্যতম অনুসষঙ্গ। লালনের আরেকটি গানে আমরা তার স্পষ্ট আভাস পাই:

কার বা আমি কেবা আমার, প্রাপ্ত বস্ত ঠিক নাহি তার
বেদকি মেঘে ঘোর অন্ধকার, উদয় হয় না দিন মনি।
লালন আরো বলেন
মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূতভাবে সব দেব-দেবী
ভোলেনা কে এসব রূপি
ও মানুষ রতন চেনে।।
জিন ফেরেস্তার খেলা
পেঁচা-পেঁচি আলাভোলা
তার নয় হয় না ভোলা
ও সে মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে।[৭]

ভাটির অঞ্চলের গানের সাথে লালনের গানের যোগসুত্র খোঁজার জন্য দক্ষিণের শিল্পী লালনের গানের অবতারণা করা হয়েছে বাউল গানে মাঝে।

বাউল গানের রচয়িতা গণের মধ্যে অন্যতম আরেকজন হলেন পাগল জালাল উদ্দিন সাঁই্ তার অন্যতম একটি গান হল:

রসিক আমার মনবান্ধিয় পিঞ্জর বানাইছে
মাটির ময়না ঘরে থুইয়া বাইরে তালা লাগাইছে ।

পরে তাঁকে নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ময়মনসিংহের জালালউদ্দিন শাহ আরো অনেক বিখ্যাত গানের রচিয়তা। এই গানটি আধ্যাত্মিক ধাচেঁর। দেহতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে এই গানে।

নেত্রকোনার অন্যতম আরেক বাউল শিল্পী হলেন ছালাম বাউল তিনি গেয়েছেন

একদিন মাটির বিছানায় হবে ঘর ও মন আমার।

---

৭.আবদুল ওয়াহাব; *বাংলাদেশের লোকগীতি, একটি সমাজতাত্ত্বাকি আখ্যান,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭) পৃষ্ঠা: ৫৩৭

**<u>হাছন রাজার গান,</u>**

ভাটির গানের অন্যতম আরেকজন রচয়িতা হলেন হাছন রাজা। হাছন রাজার গান, ভাটির গানগুলোর আওতাভূক্ত। তাঁর গানগুলোর মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি গান হলো:

১। বাউলা কে বানাইল রে
হাছন রাজারে বাউলা কে বানাইল রে
২। লোকে বলে বলে রে, ঘরবাড়ি ভালা নাই আমার
৩। নেশা লাগিল রে
বাঁকা দুই নয়নে নেশা লাগিল রে।

হাছন রাজার গান নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরো ব্যাপক আলোচনা করবো।

ভাটির গানের মধ্যে আরো কিছু গান রয়েছে। সে সব গানের মধ্যে অন্যতম হল:

<u>পালাগান:</u> পালা গানের মধ্যে অন্যতম গানগুলো হলো:

১। দেওয়ান ভাবনা,
২। মহুয়ার পালা,
৩। মলুয়া,
৪। কাজল রেখা,

৫। চন্দ্রাবতী,

৬। দস্যু কেনা রামের পালা,

৭। দেওয়ানা মদিনা।

এখানে চন্দ্রাবতীর পালা থেকে কিছু উদ্‌ধৃতি দেয়া যেতে পারে:

ডাল ভাঙ্গ পুষ্প তুল কে তুমি নাগর
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী ঐ না  নদী পার।

<u>ঘাটু গান[৮]:</u>  গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে ভাটি অঞ্চলগুলোতে অবসরকালীন সময়ে বিনোদনের জন্য ঘাটুগান করতেন বা শুনতেন গ্রামবাসী। এ গানে একজন মূল গায়েন থাকেন এবং সঙ্গী হিসেবে একজন

---

৮.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা; নেত্রকোণা।* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩); পৃষ্ঠা- ১৬৯

দোহারী থাকেন। ঘেটু শব্দের অর্থ মুলত নাচনেওয়ালী। পুরুষকে মেয়ে সাজিয়ে ঘেটু বানানো হয়তো,

সাধারণত কিশোর বয়সের ছেলেদেরকে ঘেটু সাজানো হতো। মেয়েরা এ গানে আসতো না কখনোই। ঘাটু গানের গ্রামীণ নাম ‘ছম’ গান। এই গানে প্রেম নিবেদন, বিচ্ছেদ, মান-অভিমান সবই থাকতো। নেচে

নেচে এই গান গাওয়া হতো বলে শ্রোতারা আনন্দ পেতেন। গ্রামের অভিজাত পরিবারে ঘাটু গানের আসর বসানোর প্রচলন ছিলো। পূর্ব ময়নমসিংহের গ্রামাঞ্চলে বেশি করে ঘেটুর প্রচলন ছিলো। জমিদারগণের মধ্যে যারা প্রভাবশালী তারা ঘেটু গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্তমানে এই ঘেটুগান বিলুপ্তির পথে।

বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ ঘেটুগানের উপর একটি চলচ্চিত্র নির্মান করেন যার নাম "ঘেটুপুত্র কমলা"। এই ঘেটু গানগুলো সংরক্ষণ করার একমাত্র উপায় ব্যাপক হারে গবেষণা করা। বাংলা একাডেমী অনেক গবেষণা ধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকে। লোকসংগীতের উপর প্রায় সব জেলার গবেষণামুলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছ বাংলা একাডেমি। এ বিষয় বাংলা একাডেমি ব্যাপক প্রশংসার দাবী রাখে।

ভাটি গানের বিখ্যাত আরেক সাধক পুরুষ সৈয়দ শাহনূর তাঁর গান গুলো ও ভাটির গানের অন্যতম উদাহরণ:

তুমি চিনলায় নারে মন
এঁকে মন্দিরে বসা না হৈল মিলন
এঁকে আশা এঁকে বাসা এঁকে ঘরের ধন
এঁকে ঘরে থাকতে কেন না হইল মিলন।

এছাড়া বৃহত্তর সিলেট জেলার আরো কিছু গান আছে যা ভাটির গানের অন্তর্ভূক্ত, সেগুলো হলো-

‘সারি গান’

‘বিয়ের গান’

‘গাজির গীত’

‘মালজোড়া গান’

‘পীর মুর্শিদী গান’

‘ভাটিয়ালী গান’

‘মেঘের গান’

‘বারমাসী গান’

‘মারফতী গান’

‘জারি গান’

‘সারিগান’

‘ঘাটুগান ও বিভিন্ন গীত’।

গীতগুলোর মধ্যে অন্যতম কিছু গীত হল দুই সতীনের গীত, বাইদ্যানীর গীত, কাঞ্চনমালার গীত, গৌড়া গোবিন্দের গীত, ভেলুয়া সুন্দরীর গীত, বেহুলা লক্ষীন্দরের গীত, ছুরতজান বিবির গীত, আয়না বিবির গীত, সোনা বিবির গীত, পাগলা ঠাকুরের গীত, সোনাভানের গীত, জরিনা সুন্দরীর গীত, বৃহত্তর ময়মনসিংহের গানগুলোর মধ্যে বস্যাজের গান,

ব্রতের গীত, প্রাত:স্নানের গীত, অন্নপ্রাশনের গীত, রামের বনবাস, সীতা সাবিত্রীর গীত, শ্রী রাধিকার বারমাসী ইত্যাদি।

আর কীর্তণের মধ্যে রয়েছে খেলা কীর্তণ এই কীর্তণগুলো সাধারণত নিম্ন শ্রেণির হিন্দু রমনীগণই বেশি গাইত। এছাড়া জলভরার গীত, পূঁজার মালসী গীত, কার্তিক পূঁজার গীত। কার্তিক পূঁজার গীত সারা রাত ধরে মেয়েরা গাইতো।

বাঘা কান্দেরে বাঘুনির লাগিয়া বাঘা কান্দেরে।
বাঘাবুলে বাঘিণী এই না পথে যাইও
নবীনের গরু দেইখ্যা ছেলাম জানাইও

এছাড়া মেয়েরা উত্তম পূজার মাত্রপাঠ করতো, এভাবে:

উত্তম ঠাকুর ভালা আমি কালা
উত্তম ঠাকুর ভালা ঠাকুর দাদা কালা।
উত্তম ঠাকুর ভালা আমার বাবা কালা।
উত্তম ঠাকুর ভালা আমার মা কালা।

ঠাকুরের তুষ্টির জন্য বাড়ীর অন্য সবাইকে কালো বলতে হতো এই গীতে। এই গানগুলো ও ভাটি অঞ্চলের মেয়েরা গাইতো ভাটির গানের মাঝে অন্যতম আরো একটি গান হল মলুয়ার পালা-

বিনোদের মামা সে যে জাতিতে কুলীন
হালুয়া দাসের গুষ্ঠীর মধ্যে সেই ত  প্রবীন।
ভাইগনা বউয়ের হাতের ভাত খাইতে নাহি পারি।

জাতিতে উঠুক বিনোদ পরাচিত্তি বাড়ি

মলুয়া পালার আরেকটি গীত হল এ রকম:

বার না বছরের কন্যা পরমা সুন্দরী।

না হইল বিয়া কন্যার চিন্তা মনে ভারি।

বাপ মা চায় বর রাজার সমান

এক মাত্র কন্যা মাও বাপের পরান।

তৎকালীন সমাজে বরো তেরো বছরেই বিবাহ হওয়ার সমাজিক সংস্কৃতি বিদ্যামান ছিলো। এই বয়স পার হয়ে গেলেই বাবা মা চিন্তায় অস্হির হয়ে যেতেন। সমাজের এই প্রতিচ্ছবি মলুয়ার পালা থেকে প্রতীয়মান।

মলুয়া পালার আর কয়েকটি লাইন হল এরকম:

শয্যাতে শুইয়া কন্যা ভাবে মনে মনে।

কোথায় তনে আইল পুরুষ চাঁন্দের মতন।।

কুড়া শীগার কইরা ফিরে বনে বনে।

আজি যে জলের ঘাটে দেখলাম কিবা ক্ষণে।

অর্থাৎ ১২-১৩ বছরের বালিকাদের মনেও সে বয়স থেকেই তার ভবিষৎ রাজকুমারকে নিয়ে ভাবনার জগৎ তৈরি হয়ে যেতো। এখনকার দিনের মতো আইন করে বিবাহের বয়স নির্ধারণ করা ছিলো না, তাই গ্রামাঞ্চলের মেয়েদেরকে ১২/১৩ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেয়া হতো। এটাই ছিলো রেওয়াজ। তাই বালক-বালিকাদের সংসার শুরু হতো অল্প বয়সেই।

ভাটির গানের আরেকটি শাখা হল **"কবি গান"**[৯] লোক সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ কবিগান, যা বৃহত্তর ময়নমসিংহ জেলায় বেশি প্রচলিত ছিলো। রাজদরবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও এসব কবি গান গাওয়া হতো। বিলেতি শাসকগণ ও বাংলার কবি গানের ভক্ত ছিলেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের হাট বাজার গুলোতেও হাটের দিন জারি গানের আসর বসতো হাটে। ময়মনসিংহের কবিগানে অন্যতম গায়কগণ হলো- লোচন কর্মকার, দগদগার কানাইনাথ, বলাইনাথ, হরেকৃষ্ণ নাথ, লোকনাথ চক্রবর্তী ও শক্তিরাম ব্যাপারী, সীতানাথ ঠাকুর, ভৈরব মাজুমদার, রামু সরকার প্রমুখ বিশ শতকের কবিগানের কবিয়ালগণের

---

৯.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা; নেত্রকোণা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩); পৃষ্ঠা: ৭৯

মধ্যে বিখ্যাত বালীকুমার ধর, সাধু সেখ, ইশান দত্ত। এখন কবিগানের সাথে ছড়া পাচাঁলী ও গাওয়া হয়। যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয় ঢোল বাঁশী। পূর্বে কবিগানের সাথে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হতো খোল করতাল, বেহালা। কবিগানের কোন সংগ্রহ এখন চোখে পড়ে না। কবিগান এখন গাওয়াও হয় না । *ময়মনসিংহের ইতিহাস* গ্রন্থটি হতে একটি কবি গানের নমুনা তুলে ধরা হলো:

চিতান, শ্রীরাধিকার মান ভাঙতে শ্রীনিবাস।

পরান, পায়ে ধরে ধরায় পড়ে-

তবু রাধায় না পাবে আশ্বাস।

লহর-রাধানাথ-রাধার মানে

পেয়ে অপমান হত জ্ঞান

কিছুই না পেয়ে সন্ধান

ভাসে দুটি চক্ষের জলে চলিতে দুপা পিছলে,

বাই বলে রাই কুন্ডের জলে প্রাণ ত্যাজিতে যান।

শ্রী কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমলীলা নিয়ে গাওয়া হতো এই কবিগান।

ভাটি অঞ্চলের গানের মধ্যে অন্যতম আরেকটি অধ্যায় হলো:

**পালাগীত,** পালাগীত গুলো মধ্যে অন্যতম-

‘ধোপার পাঠ’

‘বিরহিনী কাঞ্চন মালা’

ধোপার কন্যা কাঞ্চনমালার জীবনালেখ্য এই পালাগীত। রাজকুমারের সাথে কাঞ্চন মালার প্রেম বিরহ ও বিচ্ছেদের কাহিনী নিয়ে এই পালাগীত গাওয়া হতো। বিরহিনী কাঞ্চনমালার পালা গীতের কায়েকটি লাইন তুলে ধরা হলো:

অন্ধকারে বনে পথ চিনি না বা চিনি

দূরের পথ কখন ও হাটা অভ্যাস নাই

চলতে পারিনা বন্ধু যৈবন হইল ভারী

এইখানে শুইয়া বন্ধু কাটাইবাম নিশি।

সাধারণভাবে এই গানগুলোই ভাটি অঞ্চলের গান বলে প্রচলিত। এসব গানের মাঝেই বাংলার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষপট খুঁজে পাওয়া যায়। ভাটি অঞ্চলের গানের অন্যতম আরেকটি শাখা হলো:

**মেয়েলী সংগীত**[১০]: মেয়েদের নিজেদের রচনায় যে গীত রচিত হতো এবং তাদের মুখে মুখেই ফিরতো সাধারণত এসব গীত গুলোই মেয়েলী সংগীত নামে পরিচিত। বৃহত্তর ময়মনসিংহে সাধারণত এসব গানের খুব প্রচলন ছিলো। একেকটি মেয়েলী গীত যেন তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। এবং সেগুলোই তখন সমাজের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সচল রেখেছিলো। যে বাড়িতে বিবাহের কাজ শুরু হবে সে বাড়িতে প্রথম মেয়েলী সংগীত দিয়েই উৎসবের আমেজ শুরু হতো। তাদের জন্য গৃহস্বামী পান সুপারীর বরাদ্দ রাখতেন। দীর্ঘ সময় ধরে গ্রামের বিয়েতে এসব মেয়েলী গান চলতো। এসব গানের অনেকাংশ জুরে থাকতো পৌরাণিক উপাখ্যান। কল্পিত কথার ছোয়াও থাকতো এসব মেয়েলী গানে। এসব মেয়েলী গান প্রাচীন কাল হতে গাওয়া হলেও আস্তে আস্তে ভাষায় ও পরিবর্তন এসেছে। সীতা, সাবিত্রী, রুক্মিনী, সত্যভামা, শুভদ্রা, শকুন্তলা বিষয়ক গানগুলো কন্যার বাড়িতেই গাওয়া হতো বেশি যেমন:

সখি বলে শকুন্তলা, একি কুস্বভাব
হাসাইবা মুনির পুরী রাখিয়া খেতাব
অধিবাস হিত কন্যা তুমি মুনির কুমারী

পর পুরুষে দেখলো বল্যা লজ্জা নাই তোমারী।

এমন আরো কতো শত মেয়েলী গীত এখনো নারীদের মুখে বেঁচে আছে।

মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনে এসব মেয়েলী গীত হারিয়ে যেতে বসেছে। সংগ্রহ না করতে পারলে হারিয়ে যাবে এসব গান। তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষপটে এসব গানের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। কনের বাড়িতে যেমন মেয়েলী গীত দিয়ে উৎসব শুরু হতো ঠিক তেমনি বরের বাড়িতেও গাওয়া হতো এবং সবশেষ বরের বাড়িতে 'বধু ভরা' বা 'বধু ঘরা' উৎসবে এ গান গেয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটতো। 'কেন্দুয়াতে বর্তমানে' 'সুন্দরের মা ও তার দল' মেয়েলী গান পরিবেশন করেন। এসব গানের উপর গবেষণা হলে এগুলোর সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে।

---

১০.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩); পৃষ্ঠা: ১৪৯

## দ্বিতীয় অধ্যায়:

ভাটি অঞ্চলের গান: ঐতিহাসিক পটভূমি, পরিচিতি ও পরিবেশন রীতি:

ভাটি অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রেম বিরহ, আধ্যাত্মিকতা, মূল্যবোধ, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি স্পষ্টতই খেয়াল করা যায় ভাটির গানে। একটি সমাজের প্রতিচ্ছবি হলো সে অঞ্চলের সংস্কৃতি আর সংস্কৃতির অন্যতম একটি ধারা হলো গান। এখন আমরা ভাটির গানের বিশ শতকের কযেকজন নেত্বস্থানীয় গীতিকার ও সুরকারের পরিচয়, তাদের কিছু গান তুলে ধরবো যে গানগুলো বিনোদনের প্রধান ধরা হিসেবে আজও সমাদৃত সে সব গান ভাটি অঞ্চলের সমাজ-রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

**ডা: সুন্দরী মোহন দাস[১১]:** বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ সুন্দরী মোহন দাস জন্মগ্রহণ করেন সিলেটের আখালিয়া ঘাটে ১৮৫৭ সালে। সিলেট গর্ভনমেন্ট হাই স্কুল থেকে তিনি মেট্রিক পাশ করেন ১৮৭৩ সালে। ১৮৭৫ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি এফ এ পাশ করেন। মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজিতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে ১৮৭৯ সালে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভ করে। তার প্রথম কর্মস্থল ছিলো হবিগঞ্জ। সুন্দরী মোহন দাসের সাহিত্য ও সংগীত প্রীতি ছিলো। একবার ঠাকুর বাড়িতে তার পালাকীর্তন "নৌকা বিলাস" নিয়ে গান করেন। বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সামনে তাঁর সম্মানে তার আরেকটি বিখ্যাত রচনা হলো 'ছিলোটিয়া রামায়ন' । তার রামায়ণের কয়েকটি লাইন এখানে তুলে ধরা হলো:

ওই যে দেখ উঠিল বিয়ানী বালা,

হও গোষ্ঠীর দশরথ রাজা বড় ভালা

তিন বিয়া কৈলা রাজা পোড়া কপাল লইয়া

এক রানীর হইল এক গোও  পোলা।

ডা: সুন্দরী  মোহন দাসের পালা কীর্তন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে। তাঁর জীবনাচরণে তৎকালীন উদীয়মান রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান । তিনি রাজা রামমোহনরায়ের বিধবা বিবাহ সমর্থণ করে নিজে ও বিধবা রমণীকে বিবাহ  করে সমাজচ্যুত হন এবং হবিগঞ্জ ত্যাগ করে কলকাতায় প্রবাসী হন। ভাটির পুরুষগণের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের এই

---

১১.মোহাম্মদ মুমিনুল হক; *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*; (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০); পৃষ্ঠা: ৪৪২

অগ্নী পুরুষের নাম চির অম্লান থাকবে। তাঁর পালাকীর্তন গুলো সংগ্রহের প্রয়োজন। ভাটির গানের অন্যতম নির্দশন হিসাবে পরিগণিত হয় তাঁর সৃষ্টি এই পালা কীর্তন। বাঙালির বিপ্লবী হৃদয়ে স্থান করে নেয়া এই প্রবাদ পুরুষ  ডা: সুন্দরী  মোহন দাস ১৯৫০ সালে ৪ঠা এপ্রিল কলকতায় মৃত্যুবরণ করেন ।

**<u>হাছন রাজা: (১৮৫৪-১৯২২)</u>**[১২] ভাটি অঞ্চলের সংগীত অঙ্গনের অন্যতম প্রাণ পুরুষ হাছন রাকা জন্মগ্রহণ করেন সুনামগঞ্জরে লক্ষণছিরি গ্রামে। জমিদার পরিবারের সন্তান হিসাবে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়, গৃহ শিক্ষকের কাছে। আরবি ও ফার্সি ভাষায় শিক্ষা

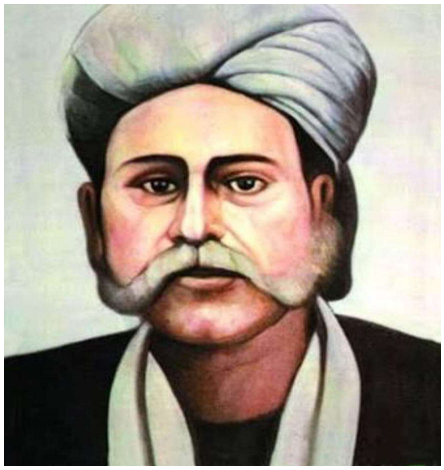

হাছন রাজা

তাঁর মাতা অত্যন্ত পর্দানশীল মহিলা ছিলেন। মাতা হুরমত জাহান হাছনের চলাফেরায় বেপরোয়াপনার কথা শুনে বিব্রত বোধ করতেন। মাতা তাঁকে তাঁর বেপরোয়া জীবনযাপন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন তিনি অস্বীকার করতেন। একবার মায়ের কাছে বিব্রত অবস্থায় ধরা পরে গেলেন হাছন রাজা তার পর জীবনের মোড় ঘুরে যায় তাঁর। হাছন রাজা হয়ে যান সাংসার ত্যাগী পরমাত্মার সন্ধানী দার্শনিক সুফী ও বৈরাগী হাছন। তিনি মুখে মুখে গান রচনা করতেন আর তার কর্মচারীগণ লিখে রাখতেন। তার সে সব গান 'হাছন উদাস' নামক গ্রন্থে ঠাঁই পায়। হাছন রাজার গানের বিষয়বস্তু ছিলো প্রেম বিরহ বৈরাগ্য ও উচ্চানুভূতি। হাছন রাজার প্রেম বিষয়ক একটি বিখ্যাত গান হল:

১। নেশা লাগিলো রে বাকা দু'নয়নে নেশা লগিলো রে

হাছন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিলরে।

২। আমি তোমার কাঙ্গালিনী গো সুন্দরী রাধা

আমি তোমার কাঙ্গালীনি।

---

১২.মোহাম্মদ মুমিনুল হক; *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*; (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০); পৃষ্ঠা: ৪৩৯

বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতা অনুভূতির কিছু গান তিনি রচনা করেন:

১। ওবা মুর্শিদ আল্লাজী ওবা হাদি আল্লাজি
আমারে ভাসাইলায় বা আল্লা ভব সিন্দু নীরে
বঞ্চিতে না পারি আমি তিরেকমাত্র তীরে।

২। আমি না লইলাম আল্লাজির নাম রে
না কইলাম তার কাম।

৩। আমি যাইমু ও যাইমু আল্লাহর ও সঙ্গে
হাসন রাজা আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাহি মাঙ্গে।

৪। লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূণ্যের মাঝার।

৫। না রহিব ঘর বাড়ি না রহিব সংসার
না রহিব লক্ষণ ছিরি নাম পরগানার।
কান্দিয়া হাছন রাজায় বলে আল্লা কর সার
কি ভাবিয়া নাচ হাছন শূন্যের মাজার।

হাছন রাজার পিতার মৃত্যুর কিছু দিন অতিবাহিত হতে না হতেই তাঁর বৈমাত্রেয় বড় ভাই দেওয়ান উবায়েদুর রাজাও মারা যান। তার কিছুদিন পর পর মাতা হুরমাত জাহান বিবির মৃত্যু হলে হাছনের জীবনে ও মনে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তখন থেকেই তিনি ভাববাদী হয়ে উঠেন। তাঁর ভাববাদী বোধের একটি গান আছে:

বাপ ও মরলা ভাই ও মরলা আরো মরলা মাও
এব কিবা বুঝলায় হাসন এ সংসারের ভাও।

হাছন রাজার গান বিষয়ক গ্রন্থ হল ‘হাছন উদাস’। এছাড়া তাঁর আরেকটি গ্রন্থ আছে যার নাম ‘সৌখিন বাহার’। এটি তাঁর ব্যবহৃত সৌখিন জিনিসপত্র সম্পর্কে। ‘হাছন উদাস’ গ্রন্থটি তাকে বিদগ্ধ মহলে বিখ্যাত করে তোলে। তাঁর গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে মানব ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতায় ভূয়সী প্রসংশা করেন। তাঁর লেখা গানে দার্শনিক তত্ত্ব আছে বলে তিনি মনে করেন। গানটি হল:

মম আঁখি হইতে পায়দা আসমান জমিন
কর্ণ হইতে পায়দা হইলে মুসলমানী দ্বীন।
শরীলে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা ও গরম
নাকেতে করিল পয়দা খুসবয় বদবয়
আমি হইতে সর্বেৎপত্তি হাসন রাজায় কয়[১৩]।

ঢোল আর মন্দিরা বাজিয়ে হাছন নিজেই মাঝে মাঝে নিজের গান করতেন। বেশির ভাগ গান তিনি গাওয়াতেন তার দরবারের গুণী শিল্পীদের দিয়ে। কুড়াপাখি, ঘোড়া, হাতি, নৌকা ও মেয়ে মানুষ ছিলো তার সখের বস্তু। বেগম হুরমত জাহান ছেলের কর্মকান্ডে বিব্রতবোধ করতেন। হাছনকে এসব কৃতকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করলে হাছন অস্বীকার করতেন। একবার হুরমত জাহান ছেলেকে সায়েস্থা করার জন্য একটি মতলব আঁটেন। তিনি ভবলেন হাছন রাজা যে নদীতে ঘুরে বেড়ান তিনি সে নদীতে পানশী চড়ে কোথাও যাবেন। হাছনের আচরণ পরীক্ষা করার জন্য তাঁর পানশির পাশ দিয়ে ঘুড়ে বেড়াবেন।

হুরমত জাহান তাঁর পানশিটিকে নতুন কাপড়ে ঢেকে দিতে বললেন যাতে করে বুঝা যায় এটি একটি কনে বাহী নৌকা। ঐ নৌপথ দিয়েই হাছন যাচ্ছিলেন।

কনেবাহী ঐ নৌকাটি চোখে পড়তেই হাছন তার পথ আগলে দাঁড়ান এবং পানশির ভেতর কে আছে দেখতে চান। মাঝিরা তাকে যতই বাধা দেন হাছনের ততই জেদ চাপে । তিনি মনে করে ছিলেন ঐ পানশীতে নিশ্চয়ই কোন সুন্দরী যুবতী আছে। হুরমত জাহান ইশরায় মাঝিদের সরে যেতে বলেন। হাসন দেখেন পানশির ভেতর একজন ঘোমটা দেওয়া নববধু বসে আছে। হাছন ঘোমটা সড়াতে চেষ্টা করলে হুরমত জাহান স্বশব্দে বলে উঠেন ‘হাছন’, ‘হাছন’। মায়ের মুখে দেখে হাছন লজ্জায় পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পরেন। তখন থেকেই হাছনের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সংসার ধর্ম ত্যাগ করে পরমাত্মার সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

তাঁর পিতা ছিলেন রাজা বিজয় সিংহ দেবের উত্তরাধিকারী বা ৭ম পুরুষ। ইংরেজ সরকারের কাছে থেকে পিতা দেওয়ানী ও ‘দেওয়ান’ উপাধি লাভ করেন। জমিদারী তদারকির কাজে বের হলে তাঁর পিতার সাথে অন্তত চারজন স্ত্রী থাকতেন। হাছন রাজা ও অনেক বিবাহ করেন। তার একটি গানেই এর প্রমাণ মেলে-

যাইবারনিরে হাছন রাজা, রাজাগঞ্জে দিয়া

আর করবায় নিরে হাছন রাজা দেশে দেশে বিয়া।

শিল্পীদের দিয়ে শেষ জীবনে তিনি তাঁর অধ্যাত্মিক সাধনা প্রসূত গানই বেশি বেশি পরিবেশন করাতেন।

---

১৩.আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন (সম্পা.); *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*; (ঢাকা: জালালাবাদ এসো, ১৯৯৫); পৃষ্ঠা: ৭৯

আল্লা ভব সমুদ্দুরে তরাইয়া লও মোরে

হাছন রাজার মনের সাধ দেখিত তোমারে।

মৃত্যু চিন্তা আচ্ছন্ন অবস্থায় হাছন রচনা করেন:

যখন মৈরা যাইবায় হাছন

মাটি হৈব বাসা,

কোথায় রৈব লক্ষণছিরি

রঙ্গেঁর রামপাশারে-

কান্দে হাছন রাজার মন মনিয়ায়রে[১৪]

প্রেম, ভালোবাসা, বৈরাগ্য, পার্থিব, ভোগবাদী, ভাববাধী, আধ্যাত্মিকতা সাধনা, পরমাত্মার সন্ধান বা মরমীবাদ বিষয়ক গান তিনি রচনা করেছেন। সামাজিক প্রতিচ্ছবি তার গানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে

প্রতীয়মান। তাঁর প্রেম বিরহবাদী গানগুলো এখানো দেশে বিনোদনের অন্যতম একটি ধারা হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। ভাটি অঞ্চলখ্যাত সুনামগঞ্জের সন্তান হাছন রাজা**র** গাওয়া গানগুলো আজকাল **আর** সুরমত গাওয়া হয় না**,** যা শ্রোতা সমাজকে পীড়া দেয়। তার গানের সংগ্রহ ও হারিয়ে যেতে বসেছে। গানগুলোর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এখন কালের দাবি। শ্রোতারা তা চায়। হাছনের গানে কোন নতুন শব্দ ও সুর আরোপন বা সংযোজন বন্ধ করতে হবে। সুনামগঞ্জে তাঁর অনেকে গাওয়া হয় নতুন শব্দ ও সুর সাংযোজন করে। এতে করে তাঁর গান তাঁর লেখা মূল ভাবার্থ থেকে সরে আসে। হাছন রাজার গান **গেয়ে** উপমহাদেশে যারা বিখ্যাত হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন।

১। নির্মলেন্দু চৌধুরী,

২। উজির মিয়া,

৩। এরফান আলী,

৪। সফিকুন্নূর,

৫। সেলিম চৌধুরী প্রমুখ।

---

১৪.দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী; *সিলেট বিভাগের ইতিহাস;* (ঢাকা: দশদিশা, ২০০৬); পৃষ্ঠা: ২০৬

হাছন রাজা তাঁর কর্মগুণে ভাটির খ্যাতিমান মরমী কবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি সব সময় অন্যের গুণের কদর করেছেন, সেজন্য তিনি নিজেও গুণের প্রশংসা পেয়েছেন। ভাটি অঞ্চলের গান হিসেবে তাঁর গানগুলো আজো পুরো দেশের বিনোদনের একটি অন্যতম মাধ্যম।

গুণের সমাঝদার মাত্রই গুণের কদর বোঝেন । হাছন  উদাসের একটি গানে তিনি তেমনটি বলে গেছেন শ্রোতাদের উদ্দ্যেশ্য:

আমি করিবে মানা, অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না।
কিরা দেই, কমস দেই, আমার এই বইয়ে কেউ হাত দিবেনা।
অপ্রেমিক শুনলে এ গান কিছু মাত্র বুঝবে না
কানার হাতে সোনা দিলে লালধলা চিনবে না
হাছন রাজা কসম দেয় আর দেয় মানা
আমার গান শুনবে না যার প্রেম নাই জানা।[১৫]

অর্থাৎ গানের প্রেমে যিনি না পড়েছেন তিনি তাঁর গান বুঝবেন না, তিনি জীবত কালেই বুঝে ছিলেন, না বুঝে তাঁর গানে কেউ সুর ও শব্দ আরোপ করতে পারে , তাই তিনি কেবল সামঝদার কেই তাঁর গান শুনতে বলেছেন । তার এই তাগিদে সাড়া দিয়ে তার অগ্রন্থিত গানগুলো খুজে বের করে সংরক্ষণ করতে হবে এতে করে ভাটির গানের সংগ্রহ আরো সমৃদ্ধ হবে বলে আমি মনে করি।

রাতে খাওয়া পর্ব শেষে তিনি গান রচনা করতেন। এসব গানে নিজে সুর দিতেন এবং তাঁর গায়িকাদের দিয়ে গাওয়াতেন। সোনাজান (গায়িকা) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। বৈরাগ্য নির্ভর গানগুলোর মাধ্যে অন্যতম হল:

১। ওবা মুর্শিদ আল্লাজী ওবা হাদি আল্লাজী
আমারে ভাসাইলায় বা আল্লা ভব সিন্ধুনীরে
বঞ্চিতে না পারি আমি তিরেক মাত্র তীরে।

২। তোর লাগ মোর কিসের দয়মায়া গো ভবজানের মা
আমি তো চলিয়া যাইমু পড়িয়া রইব কায়া।

---

১৫.আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন (সম্পা.); *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*; (ঢাকা: জালালাবাদ এসো., ১৯৯৫); পৃষ্ঠা: ৮৩

৩। মাঠির ও পিঞ্জিরার মাঝে বন্ধি হইয়ারে
কান্দে হাছন রাজার মন মনিয়ায় রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একটি গানের কথা তাঁর একটি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন:-

না রহিব ঘর বাড়ী না রহিব সংসার
না রহিব লক্ষণ ছিরি নাম পরগনার,
কান্দিয়া হাছন রাজা বলে আল্লা **কর** সাব
কি ভাবিয়া না হাছন শূন্যের মাজার।

মরমী  এই কবি ১৯২২ সালে ১৯ নভেম্বর মুত্যুবরণ করেন।

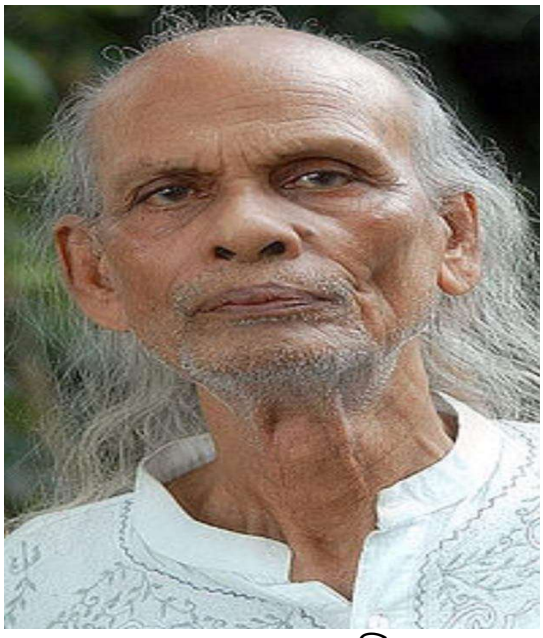
শাহ আব্দুল করিম

শাহ আব্দুল করিম[১৬]: শাহ আব্দুল করিমের জন্ম ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯১৬ আর মৃত্যু ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯। শাহ আব্দুল করিম ভাটি অঞ্চলে জনপ্রিয় বেশি। তিনি শহরের মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা পান মাত্র কয়েক বছর আগে। এ পর্যন্ত প্রায় দেড় সহস্রাধিক গান লিখেছেন তিনি। সুনামগঞ্জের দিরাই থানায় উজানধল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার শৈশব কাটে দারিদ্র্য আর জীবন সংগ্রামের মাঝে।তাঁর প্রেরণা ছিলেন তাঁর স্ত্রী আবতাবুন্নেছা। তার গান ছিলো অন্যায়, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তাঁর গানের মাঝে আছে শরিয়ত, মারিফত, প্রেম, ভালবাসা, বিদ্রোহ সব কিছুর মিশেল।

তাঁর সম্পর্কে শহরাঞ্চলের মানুষ জানার আগে তাঁর গান কেবল ভাটি অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখেই ফিরতো। সাম্প্রতিক কালে তাঁর

গানগুলো নতুন করে গেয়ে কয়েকজন শিল্পী বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, এর ফলে দেশব্যাপী তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়।

তিনি তাঁর গানের অনুপ্রেরণা পান ফকির  লালন শাহ্, পুঞ্জ শাহ, দুদ্দু শাহ এর দর্শন থেকে। ধারণা করা হয় শিল্পী উকিল মুন্সি আর শাহ আব্দুল করিম একই আসরে গান করতেন। বাউল  শাহ আব্দুল করিম ২০০১ সালে  একুশে পদক লাভ করেন। ২০০০ সালে তিনি সাহিত্যিক আব্দুল রউফ চৌধুরী পদক পান।

---

১৬.আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন (সম্পা.); *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*; (ঢাকা: জালালাবাদ এসো, ১৯৯৫); পৃষ্ঠা: ১০৯

জীবন্ত এই কিংবদন্তির গান এখন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। এতো জীবনধর্মী, ভাবধর্মী মারফতি ও শরিয়তির মিশেল অন্য কারো গানে অপ্রতুল। শাহ আব্দুল করিম ২০০৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ৭টা ৫৮ মিনিটে সিলেটের একটি ক্লিনিকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভাটির পুরুষ শাহ আব্দুল করিম শৈশব, কৈশর ও যৌবনের পুরোটা সময় তাঁর সুনামগঞ্জে দিরাই থানার উজানধল গ্রামেই কাটে। শৈশবকাল থেকেই তিনি গান রচনা ও সুর করেন। তাঁর সংগীত জীবনের অনুপ্রেরণা ছিলেন তাঁর স্ত্রী আবতাবুন্নেছা, যাকে তিনি আদর করে ডাকতেন সরলা বলে। তাঁর ১০টি গান অনুদিত হয় ইংরেজিতে বাংলা

একাডেমির উদ্যোগে। সিলেট বিভাগীয় কমিশনারের উদ্যোগে বাউল আব্দুল করিমের সমগ্র সৃষ্টিকর্ম নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত তার ৬টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

বইগুলো হল:

১। আবতাব সংগীত,

২। গণ সংগীত,

৩। কালনীর ঢেউ,

৪। ভাটির চিঠি,

৫। কালনির কূলে ও

৬। দোলনমেলা।

সম্প্রতি সিলেট জেলা মিলনায়তনে তাঁর রচনাসমগ্র "অমনিবাস" এর মোড়ক উম্মোচিত হয়।

বাউল গানের এই কিংবদন্তির কিছু জনপ্রিয় গান হল:

১। বন্দে মায়া লাগাইছে, পিরিতি শিখাইছে,

২। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম

৩। গাড়ি চলে না, চলে না, চলেনা রে গাড়ি চলে না।

৪। আমি কূল হারা কলঙ্কিনী-

সরলার লাশের জানাজা পড়ানো হবে না বলে তিনি সরলার শবদেহ সামনে নিয়েই এই গানটি রচনা করেছিলেন মনের দুঃখে। তিনি গান গাইতেন বলে গ্রামের লোকজন তার স্ত্রীর লাশের জানাজা পড়াতে চায়নি।

৫। কেমনে ভুলিবো আমি, বাঁচি না তারে ছাড়া,

৬। রং এর দুনিয়া তারে চায় না,

৭। আমি বাংলা মায়ের ছেলে,

৮। কোন মেস্তরি নাও বানাইচে,

৯। বসন্ত বাতাসে সই গো,

১০। সখী কুঞ্জ সাজাও গো ইত্যাদি।

ভাটি অঞ্চলের মানুষের সুখ, দুঃখ, প্রেম ভালবাসার ছবি তাঁর গানে আমরা দেখতে পাই। মারফতি ও শরিয়তি আঁঙ্গীকে ও তাঁর গানগুলোর অনেক ধরণের ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পাই:

মুর্শিদ ধন হে, কেমনে চিনিব তোমারে,

দেখা দেওনা, কাছে নেও না,

আর কত থাকি দূরে,

কেমনে চিনিব তোমারে?

আরো একটি গানে আছে-

আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, হোক নাম তোমারই

মোকম মঞ্জিলের নাম করে দাও জারি,

আমি দীনহীন, তুমি না বাসিও ভিন,

তুমি না করাইলে মাবুদ আমি কি পারি?

আর ও একটি জনপ্রিয় তাঁর গান:

আমি তোমার কলেরগাড়ী তুমি হও ড্রাইভার

তোমার ইচ্ছায় চলে গাড়ি,

দোষ কেন পরে আমার?

আমি তোমার কলের গাড়ি, তুমি হও ড্রাইভার।

প্রেম ও মারফতি ধারণার অস্থিত্ব পাওয়া যায় এই কিংবদন্তির গানে:

যা দিয়েছো তুমি আমায়,

কি দেব তার প্রতিদান,

মন মজানে ওরে বাউলাগান

এবং

বন্দে মায়া লাগাইছে, পিরিতি শিখাইছে,

আরো আছে,

বসন্ত বাতাসে সই গো, বসন্ত বাতাসে,

এই গানগুলো নিয়ে বিভিন্ন  আঙ্গিকে চিন্তা করা যায়। কিংবদন্তিও তুল্য তাঁর এই গানগুলোর অনুপ্রেরণা ছিলেন তাঁর স্ত্রী, আবতাবুন্নেছা, যাকে তিনি তাঁর 'আবতাব সংগীত' বইটি উৎসর্গ করেছিলেন এবং তার নামেই বইটির নাম রেখেছেন 'আবতাব সংগীত'।

ভাটি অঞ্চলের মানুষের সুখ, দুঃখ, প্রেম, বিরহ আধ্যাত্মিকতা সবই তাঁর গানে প্রতীয়মান। জীবনভর তিনি দারিদ্র্য ক্লীষ্টে জর্জরিত ছিলেন। কৃষিকাজে তাকে শ্রমব্যয় করতে হয়েছে। তিনি তার পরও গান ছাড়েননি। তার আধ্যাত্বিক ও বাউল গানে দীক্ষা গুরু ছিলেন সাধক কামাল উদ্দিন, সাধক রশিদ উদ্দিন, শাহ ইব্রাহিম মস্তান বকস প্রমুখ।

বাংলা বাউল গানের কিংবদন্তি শাহ আব্দুল করিম জীবনের প্রথম দিকে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে মালজোড়া গেয়ে ফিরতেন। দারিদ্র্যের তারণায় তাকে কৃষি কাজ করেও জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছে। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত কাটিয়ে, নিজেকে তুলে এনেছেন খ্যাতির চূড়ায়। লেখক সুমন কুমার দাশ প্রখ্যাত বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিমের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

'গাড়ি চলেনা, চলে না' এই গানটিকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, তাহলে দেখা যাবে, প্রথমত ইমান, নামাজ, রোজা ইত্যাদি ছাড়া আমরা বেহেস্ত

পাবো না, আল্লাহর রহমত বা করুণা পাবো না। আবার এভাবেও যদি ভাবি যে, কর্মছাড়া কর্মফল ভোগ করা যায় না।

আবার আরেকটি গান আছে-‘ বন্দে মায়া লাগাইছে’ এ গানটি আবহমান বাংলার প্রেমে কাতর প্রেমিক পুরুষের/নারীর প্রেমের  আভাস পাওয়া যায়। তার যে ভাষণ শৈলী ও সুর তা গ্রাম বাংলা ছাড়িয়ে শহরের মানুষের মনকেও নাড়া দিয়ে যায়।

আরো আছে- ‘আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম’, এই গানেটি। এসমস্ত গান অতীত আর বর্তমানের বাস্তবতার ফারাক কতটুকু প্রকট আর সমাজের প্রেক্ষাপটও কত কঠিন ছিলো, তার আভাস পাওয়া যায়। এ গানে শাহ আব্দুল  করিমকে একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবে আবিষ্কার করা যায়।

গ্রামের নওজোয়ান, হিন্দু-মুসলমান,

মিলিয়া বাউলাগান আর মুর্শিদী গাইতাম

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম।।

হিন্দু বাড়িতে যাত্রা গান হইত

নিমন্ত্রন দিতো আমরা যাইতাম

জারি গান বাউল গান আনন্দের তুফান

গাইয়া সারি গান নৌকা দৌড়াইতাম।

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম।।

বর্ষা যখন আইত গাজির গান হইত

রঙে ঢঙে গাইত আনন্দ পাইতাম

কে হবে মেম্বার কেবা গ্রাম সরকার

আমরা কি তার কোন খবরও লইতাম।

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম।।

করি যে ভাবনা সেদিন আর পাব না

ছিল বাসনা সুখী হইতাম

দিন হইতে দিন আসে যে কঠিন

করীম দীনহীন কোন পথে যাইতাম

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম।।

**চন্দ্রাবতী দত্ত:** রাজ নগরের স্বভাব কবি। গ্রাম্য বধুর কম প্রতিভা নিয়ে 'দূর্গা বারমাসী' গান রচনা করেন চন্দ্রাবতী দত্ত। এই গানগুলো এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। জনপ্রিয় এই গানগুলো ভাটি অঞ্চলের গানের অলংকার। এই অলঙ্কার গুলো সংরক্ষণ আজ যুগের দাবি। বেশি বেশি করে গবেষণা হলে এসব গান সংরক্ষিত হবে।

পদ্মনাথ বিদ্যা বিনোদ: **(১৮৬৪-১৯৩৮)**

বানিয়াচঙ্গ এর বিদ্যাভূষণ পাড়ায় ১৮৬৪ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহন করেন এক প্রবাদ পুরুষ যার নাম পদ্মনাথ বিদ্যা বিনোদ। ১৮৯০ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ইংরেজি ,দর্শন ও সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন । ১৮৯২ সালে তিনি ইংরেজিতে এম.এ.পাস করেন। 'বিদ্যা বিনোদ' তাঁর উপাধি । ঢাকা 'স্বরস্বত সমাজের' বাক্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি এই উপাধি লাভ করেন । ১৮৯৬ সালে সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজে অধ্যাপনা করে তার কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯০৫ থেকে ২৩ সাল পর্যন্ত বাটন  কলেজে অধ্যপনা করেন, মাঝে আসাম সরকারের কর্মচারীর চাকুরী ও করেন। তিনি অনেক পুঁথি রচনা করেন। তার রচিত পুঁথি ও অন্যান্য গ্রন্থগুলো গুলো হলো:

১.প্রবন্ধষ্টক -১৩১৭ বাংলা,

২. হেড়েম্ব রাজ্যের দন্ড বিধি -১৩১৭,

৩. হিন্দু বিবাহ সংস্কার -১৩২১,

৪. বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরসন -১৩২১ ,

৫. প্ররিক্ষরামকু ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমন ১৩২১,

৬. রাসকুমার চরিত্র-১৩২৬,

৭. আলোচন চতুষ্ঠায়,

৮. কামরুপ শাসনাবলী -১৩২৬ বাংলা,

৯. গেইট হিষ্ট্রী অব আসাম -১৩১৫ বাংলা,

১০. পেনেল কোড্র অব কিং অব কাছাড় -১৩১৭।

তাঁর এ সমস্ত গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপট খুঁজে পাওয়া যায় । তাঁর পুঁথিগুলোতে এই অঞ্চলের আর্থ- সামাজিক পেক্ষাপটের একটি ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর পুঁথিগুলো সংগ্রহ করলে ভাটির সংস্কৃতি ও বিনোদন অনেক সমৃদ্ধ হবে। এই পুঁথি রচয়িতা ১৯৩৮ সালের ৩০ অক্টোবর কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহ ত্যাগ করেন।

**<u>ব্রজেন্দ্র নাথ অর্জুন:</u>** রাজনগর মালার নন্দউড়া গ্রামে ব্রজেন্দ্র নাথ অর্জুন জন্মগ্রহন করেন বাংলা ১৩০৬ সালে। তিনি রাজনগরের প্রতিষ্ঠিত লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক প্রবন্ধ কবিতা ও গানের সংকলন রয়েছে। তাঁর গানের  সংকলন সংরক্ষন করলে ভাটির বিনোদন কে আরো সমৃদ্ধ করবে। কারণ তাঁর গান সমসাময়িক কালের সমাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত । ১৩৯৭ সালের ৫ ই জ্যৈষ্ঠ তিনি দেহত্যাগ করেন।

**<u>হেমাঙ্গ বিশ্বাস(১৯১২-১৯৮৭)[১৭]:</u>**

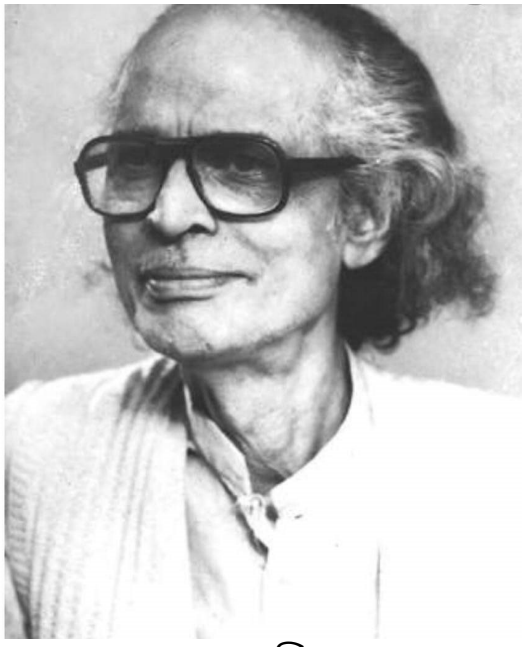

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

বাংলা ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৭ অগ্রাহায়ণ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯১২ সালের ১৪ ডিসেম্বর সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার মিরাশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। বাবা হরকুমার বিশ্বাস ও মা সরোজিনী দেবী। ছোট বেলা থেকে সুরের মায়াজালে বন্দি হন তিনি। গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ আরো তাঁকে বেশি করে গান প্রেমিক করে তোলে।

বাবা হরকুমার বিশ্বাস ও মা সরোজিনী দেবী। ছোট বেলা থেকে সুরের মায়াজালে বন্দি হন তিনি ।

---

১৭.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সমগ্র-১*; (কলকাতা: দে'জ, ২০১২), কাভার পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ আরো তাঁকে বেশি করে গান প্রেমিক করে তোলে। বাবা ছিলেন দাপুটে জমিদার । কিশোর বয়স থেকে রাজনীতির প্রতি ভীষন ভাবে সচেতন হয়ে উঠেন এই জমিদার পুত্র। অনেকবার জেলও খাটেন । তারপর ও স্বদেশ রক্ষার আন্দোলন থেকে কখনো পিছপা হননি। গান রচনা করে ও তিনি আন্দোলনকে আরো বেগবান

করেন। প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়ে তাঁর গান চারদিকে। তিনি বলতেন ‘গানের আধার হল সুর। সুরাংশ বিচ্যুত গানের কথাগুলো প্রাণহীন দেহের মতো’, ‘গণসঙ্গীত গণআন্দোলনের প্রাণ বস্তু’। শঙ্খচিলের গান তাঁর গণসঙ্গীতের  এক অমূল্য সংকলন। তাঁর  এই গানগুলো ছিলো অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ও প্রগতির সপক্ষে জড়ালো অবস্থান।  সমাজ, রাজনীতি সচেতন ও সংগীতানুরাগী প্রত্যেকের কাছে তাঁর গান আজো আদরণীয়। শ্রমিকের প্রতি মালিকের নিপীড়ন তাঁকে বেশি পীড়া দিতো। শ্রমিকেদের জন্য তাঁর অনেক গণসংগীত রয়েছে। “শঙ্খচিলের গান” সংকলনটির বাজার মূল্য অনেক বেশি ছিলো বলে সেই সংকলনের মুখবন্ধে তিনি লজ্জা প্রকাশ করেছেন সে জন্য এবং প্রকাশককে অনুরোধ  করেছেন সুলভ মূল্যে যেন এই সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। অনেক জনপ্রিয় বিদেশী গানের অনুবাদও করেন তিনি। তারমধ্যে অন্যতম হল:

১। বর্ণ বিদ্বেষনীতির বিরুদ্বে রচিত মার্কিন লোকসংগীত শিল্পী পিট সিগার এর বিখ্যাত গান

We shall overcome, se shall overcome

one day , oho deep in my heart, I do believe

that we shall overcome one day[১৮](ii)

এর অনুবাদ করেন তিনি-

আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয় একদিন

আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়, আমরা করবো জয় নিশ্চয় (ii)

তাঁর গান ও রচনা নিয়ে দে'জ পাবলিশিং একটি বই প্রকাশ করেছে। যার নাম 'হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সংগ্রহ'। নিরন্তর সৃষ্টির মাঝে ডুবে থাকা ক্লান্তিহীন এক কবি সাহিত্যিক ও একাধারে গীতিকার ও সুরকার। তিনি বাঙালি হলেও তাঁর রচনা সমগ্র প্রকাশ করে দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, অর্থাৎ বাংলাদেশে তাকে নিয়ে কোন প্রকাশনা নেই। আমার গবেষণার তাগিদ বোধ করি এজন্যই।

---

১৮.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সমগ্র-১*; (কলকাতা: দে'জ, ২০১২); পৃষ্ঠা: ৬৮

শাহ আবদুল করিম, উকিল মুন্সী, জালাল উদ্দিন, রাধারমন , সৈয়দ শাহনূর, দূর্বিন শাহ, নির্মলেন্দ চৌধুরী, রমেশ রায়, প্রাণেষ দাস এর মতো গীতিকার ও সুরকাদের লেখনী গুলো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে প্রকাশনা ও সংগ্রহের অভাবে।

ভাটির ঐতিহ্য এসব গান ও গীতি কবিতা আজ সংগ্রহের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে। এসব প্রকাশনাগুলো সংগ্রহ করে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। আর তার ফলেই ঐতিহ্যবাহী এসব গান যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে। বাংলায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে এসব ভাটির গান অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এসব গান কতটুকু ভুমিকা রেখেছিলো এসব খুঁজে বের করে সংরক্ষণ করতে হবে

অনেক অনেক প্রকাশনার মাধ্যমে। কিন্তু ভাটির গানের প্রকাশনার বড়ই অভাব।আমেরিকার একজন বিশিষ্ট লোকসংগীত শিল্পীর লেখা মহত্তম গীতিকা (Noblest ballad) যা একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। সেই বিখ্যাত গানের অনুবাদ করেন তিনি-

নাম তার ছিলো জন হেনরী,
ছিলো যেন জীবন্ত ইঞ্জিন,
হাতুরীর তালে তালে গান গেয়ে শিস দিয়ে
খুশী মনে কাজ করে রাত দিন
হো হো (৪) খুশি মনে কাজ করে রাত দিন(ii)[১৯]

দেশের গান যখন সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব দরবারে পরিচিত হয় তখন তিনি সে অবস্থার নামকরণ করেন "গানের বাহিরানা" তাঁর বিখ্যাত এমন অনুবাদ গুলো বাহিরানারই প্রমাণ করে।

ভাটিয়ালী গান সম্পর্কে তিনি তাঁর 'হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থে বলেছেন:

ভাটিয়ালি যখন গাই মনের পর্দায় সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে সেই মানুষ ও প্রকৃতির ছবির সারি। কিন্তু সেই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নাগরিক শ্রোতার মনের পর্দায় কি সে ছবি প্রক্ষিপ্ত হয়?

ভাটিয়ালির সুজন নাইয়াকে হয়তো তারা কোনদিন দেখেছেন দূরে কোনো পালের আড়ালে চলন্ত ট্রেনের কামড়া থেকে রোমান্টিক চোখে কিন্তু ভাটিয়ালির বিলম্বিত রেশের সুজন নাইয়াকে কি এই চোখে চিনতে

পারা যায়? ঝড়োদিনে বর্ষার হাওরে পাগলা ঢেউয়ের সওয়ার সুজনকে কি তারা দেখেছেন? কড়া হাতে বাঘথাবা মুঠোয় হালের হাতল ধরে শঙ্গচিলের মতো ঝড় কাটিয়ে যাওয়া সুজনকে না দেখলে,

---

১৯.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সমগ্র-১*; (কলকাতা: দে'জ, ২০১২); পৃষ্ঠা: ৬৯

নৌকাবাইচে মরণপন পাল্লায় দলবদ্ধ হুল্লোড়ে সারি গানের ছান্দসিক সুজনকে না দেখলে, নিস্তরঙ্গ  ভাটগাঙ্গে কর্মরত সুজনের লিলুয়া বাতাসে ভাটিয়ালির ভাবালুতাকে কি করে উপলব্ধি করবেন?

তাঁর রচিত এবং নির্মলেন্দ চৌধুরীর সুরারোপে বিখ্যাত একটি গান হল:

হবিগঞ্জের জালালী কইতর
সুনামগঞ্জের কুরা, সুরমা নদীর গাংচিল আমি
শুন্যে দিলাম উড়ো
শূন্য দিলাম উড়ারে ভাই যাইতে চান্দের চর
ডানা ভাইঙ্গা পড়লাম আমি কৈলকাত্তার উপর।
তোমরা আমায় চিনছনি (।।)
এই সুরে আছেরে বন্ধু অস্থথ বটের ছায়া
এই সুরে বিছাইয়া দেরে শীতল পাটির মায়া
বন্ধু  অস্থথ বটের ছায়া।

এইনা সুরের পালের দোলায় খুশির হাওয়া বয়

এই সুরের দৌলতে আমি জগৎ করলাম জয়
তোমরা আমায় চিনছনি[২০]। (রচনাকাল-১৯৬২)

হেমাঙ্গ বিশ্বাস এখানে নিজেকে পাখির সাথে তুলনা করেছেন। কখনো তিনি হবিগঞ্জের জালালী কবুতর কখনো সুরমা নদীর গাঙ্গচীল। তার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি কলকাতায় গিয়ে দেখেছেন সেখানে বাংলাদেশের হাওরের মতো নেই পানি, নেই সেথায় তাজা মাছ, নেই সেই হিজল গাছ। কলকতার নিদ্রাহারা নগরে তিনি ভাটিয়ালি গেয়ে নিজেকে বিশ্বের দরবারে চিনাতে চেয়েছেন তিনি সেই বাঙালি যিনি গান গেয়ে জগৎ জয় করতে চান । এখানে বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা সেই চিরায়ত রুপকে বিশ্বের দরবারে মেলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর গান দিয়ে । এটাইতো গানের বাহিরানা।

---

২০.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সমগ্র-১*; (কলকাতা: দে'জ, ২০১২) পৃষ্ঠা: ১২৯

হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছেন সংগীতের কোন ঘরানা নেই রয়েছে বাহিরানা, ঐতিহাসিক আঞ্চলিকতা, শিল্পের গায়কীকে মেলে ধরা হয় এক একটা অঞ্চলের জন জীবন[২১]। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য জিনিসটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন-

আব্বাস উদ্দীনের মতো অসামান্য ভাওয়াইয়া গায়কও ভাটিয়ালী গাইতে অক্ষম কারণ উত্তরবঙ্গের যে অঞ্চলের মানুষ তিনি সেটা ভাটিয়ালীর জমি নয়। আবার আব্বাস উদ্দিনের আত্মজীবনীতে আছে যে - শচীনদেব বর্মণ তাঁর কাছে ভাওয়াইয়া শিখতে চেয়েছিলেন- কিন্তু পরে বলেন (শচীনদেব বর্মন) আপনার  এই গলাভাঙাটা আমার উঠছে না মোটেই। শচীন দেব সত্যিকারের সুর শিল্পী এবং ভাটিয়ালী গানের শিল্পী তাই তিনি আর ভাওয়াইয়া শিখতে যাননি কখনো। ঠিক তেমনিভাবে আব্বাস উদ্দিন এর ভাটিয়ালী গান গাওয়ার প্রবল ইচ্চা ও চেষ্টা সম্পর্কে পল্লী কবি জসিম উদ্দিন বলেছেন -"অনেক চেষ্টা করে দেখেছি ভাটিয়ালীর বিশেষ খোঁচ ও ভাজ গুলি আব্বাসের গলায় ওঠে না।" এখানে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মুল বক্তব্য এটাই যে সুরের আঞ্চলিকতা কলতে একটা  নিরেট সত্য আছে। আছে সে অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট যে প্রেক্ষাপটে ভাটি অঞ্চলের গানের রচয়িতাগণ গান রচনা করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচিত প্রতিটি গানেই  তাঁর সমসাময়িক কালের আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। ধামাইল নাচের জন্য তিনি কয়েকটি অসামান্য ধামাইল গান রচনা করেন-

শুনছনি শুনছনি সইলো শুনছনি
এই ভারতে ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি লো
হাহাজার ধ্বনি।।
জন্ম ভুমি ভারতভুমি মোদের সোনার খনি

সেই ভারতের ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি লো
হাহাকার ধ্বনি।।
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে দু:খের কাহিনী
শুনলে পরে পরান ফাটে চক্ষে আসে পানি লো
চক্ষে আসে পানি লো
মা বেচেঁ ছেলে মেয়ে ক্ষুধায় পাগলিনী
কুলের বধু মান বিকাইয়া হইল কলংকীনি।।

---

২১.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সমগ্র-১*; (কলকাতা: দে'জ, ২০১২) পৃষ্ঠা: ২১৭

দেশে যখন লাগল আগুন শুনলো সজনী
চুপকরে আজ ঘরে বসে করবনা বেইমানী লো
করবনা বেইমানী।

বাংলার মহামারী নিয়ে তিনি একটি কবি গান রচনা করেছেন -

বাংলাদেশের দুঃখের কথা
কইতে লাগে বুকে ব্যাথা
(ভাইবে) শুনার বারতা।
দেশজোড়া এই ক্ষুধার জ্বালায়
ধরল ব্যাধি ম্যালেরিয়ায়
মহামারীর আগুন যে হায়
ছড়ায় যথা তথা!!

ম্যালেরিয়ায় গা উজাড়

মরে মানুষ হাজার হাজার

কত ঘর যে হয় ছারখার

যায় না বলা তা!!

গাঁয়ে ছিলো সোনার সংসার

ছিলো কত ক্ষেত খামার

এমন চাঁদের হাট বাজার

আজ গেল কোথা!!

সুখের গৃহে ছিলো যারা

আজকে কোথায় গেলো তারা

কত মাতা পুত্র হারা

পাষান ভাঙ্গিছে মাথা!!

কেবা পোড়ায় কে দেয় গোর

কবর হইল ঘরের দোর

টাইনা নেয় শিয়াল কুকুর

মৃত লোকের মাথা!!

আজকেরে ভাই এমন দিনে

ভাই এ যদি ভাই না চিনে

মানুষ তারে কই কেমনে

মানব জন্ম বৃথা!!

দুঃখের কথা কি  আর বলি

আজো কিরে দলাদলি

ভেদাভেদ আয়রে ভুলি

চাই সবের একতা ।।

দেশপ্রেমিক  আয়রে আয়

হিন্দু - মুসলিম তোরা কোথায়

এক না হলে সারা বাংলায়

জ্বলবে শ্মশান চিতা[২২] ।।

ম্যালেরিয়া যখন বাংলায় মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে তখনকার পেক্ষাপটে তিনি এ গান রচনা করেন। ম্যালেরিয়া নিয়ে তাঁর লিখিত আরেকটি বিখ্যাত গান হল - বানিয়াচঙ্গের মহামারীর গান।

---

২২.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সমগ্র-১*; (কলকাতা: দে'জ, ২০১২) পৃষ্ঠা: ১২

মহামারী আকারে যখন ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়ে  তখন তিনি হিন্দু মুসলমানের ঐক্য কামনা করেছেন সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য। ভাটি অঞ্চলের মানুষগণ সহজ-সরল জীবন যাপন করে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা পোষণ করে সে সব মানুষ কে তিনি ঐক্যের ডাক দেন

তৎকালীন সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য। আবার দেশে রাজনৈতিক সংকট বিরাজকালে তিনি দেশপ্রেমোদ্দীপক গান রচনা করে ঐক্যের ডাক দিতেন । ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও তিনি ভাটিয়ালী গান রচনা করেছেন গানের মাধ্যমে কর্মীদের অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেছেন।

ওরে ও চাষি ভাই-

তোর সোনার ধানে বর্গী নামে দেখারে চাহিয়া

তুই আর কতকাল রইবি ঘুমে ওঠারে জাগিয়া!!

তোর লুটে নেয় ফসল-

দেশ-বিদেশী ধনিক বনিক,ফ্যাসী দস্যূদল

পঙ্গপালে দলে দলে ছাইল দুনিয়া!!

চার দিকেতে উঠছে হাহাকার

কত শত পল্লী শহর যায় রে ছারখার

মা- বোনের চোখের জলে বয়রে দরিয়া[২৩]।

আবার কখনো গান রচনা করেছেন চাষিদের জন্য ফসল বাড়ানোর মিলিত গান " নৌকা দৌড়ের জন্য লিখেছেন সারি গান -

তোরা আয়, আয়রে ছুটে আয়

এ ভারতের হিন্দু মুসলিম -কে আছ কোথায়।

বাঁচিবি যদি ত্বরা করে আয়  কে আছ কোথায়

এ ভারতের হিন্দু - মুসলিম কে আছ কোথায়,

স্বাধীন হাওয়া লাগল পালে স্বরাজের নৌকায়, কি রে - হৈ-হৈ হৈয়।।

মজুতদারদের বিরুদ্ধে লিখেছেন মজুতদার বিরোধী গান, মজুতদারকে তিনি তুলনা করেছেন সর্বনাশের অগ্রদূত হিসেবে। তাদেরকে তিনি দেশদ্রোহী বলেছেন। ছাত্রদের কে উদ্দীপনা যোগানোর জন্য লিখেছেন বহু গান। চা বাগানের মুজুরদের জন্য লিখেছেন 'পাতি তোলার গান'।

---

২৩.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সমগ্র-১*; (কলকাতা: দে'জ, ২০১২) পৃষ্ঠা: ১৫

সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাইদ্যা গানের সুরে লিখেছেন 'বেদের গান' যা ভাটি অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রকাশ পায়। আবার ১৯৪৮ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটন যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন রচনা করেন "মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য"[২৪]

মাউন্ট ব্যাটেন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে
থুইয়া গেলায় ও
তোমার সোনার পুরী আন্ধার কইরা ও ব্যাটন সাহেব
তুমি কই চলিলায়,
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস গ্রামীন গীত এবং মরমী গানকে নগরজীবনে আমদানী করেছেন যা কেবল দেশীয় সংস্কৃতির বাহিরানাকে মেলে ধরেননি তাই নয় বরং তিনি গণমানুষের মধ্যে প্রচলিত লোকগীতিকে রুপান্তরিত করেছেন শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ গণসঙ্গীতে। আবার কখনো তিনি তৈরি করেছেন শক্তিশালী রাজনৈতিক গীতিনাট্য। এই ধারার সবচেয়ে বিখ্যাত গীতিনাট্য হল 'মাউন্ট ব্যাটেন মঙ্গলকাব্য'। এতে কাজ করেছেন উৎপল দত্ত, সলিল চৌধুরী এবং দেবব্রত বিশ্বাসসহ সব বিখ্যাত মানুষ। ১৯৪৬ সালের নৌ বিদ্রোহ নিয়ে

কলকাতায় মঞ্চের আরেকটি সাড়া জাগানো নাটক ‘কল্লোল’ এর জন্য গান লিখেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। ১৯৮৫ সালে কলকাতায় এক বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর কাছে কিছু সহজাত সুর ছিল বলে তিনি ‘Revelutionary Zeal’ নিয়ে এসব কালজয়ী গণসঙ্গীত ও গীতি নাট্য নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। তিনি কলকাতা, দিল্লী এবং ঢাকাসহ সমগ্র উপমহাদেশের মঞ্চ জুড়ে বিখ্যাত “মাউন্ট ব্যাটেন মঙ্গলকাব্য” কিভাবে লিখেছিলেন তাঁর বর্ণনা তিনি দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে:

> আমাদের সিলেটের লাউতা বাহাদুরপুরের সোনাউল্লাহ নামে এক জাহাজ কর্মী অসাধারণ ব্যাঙ্গাত্মক বক্তৃতা দিতেন। দশটা গুরুগম্ভির বক্তৃতায় যে কাজ হতো না সোনাউল্লাহর একটা ব্যাঙ্গাত্মক বক্তৃতায় তার চতুর্গুণ কাজ হতো। ব্যাঙ্গাত্মক ফর্মের এই অসাধারণ স্বার্থকতা আমাকে
> বাবু গোপীচন্দ্র রায়
>
> সোনারপুরী আন্ধার করিয়া লুকায়লা কোথায়?
> পোয়ায় কান্দে, পুরিয়ে কান্দে, কান্দে বাবুর মায়
> দুই তলার উপরে কান্দে রাসমনি বেশ্যায়[২৫]।

---

২৪.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সমগ্র-১*; (কলকাতা: দে’জ, ২০১২) পৃষ্ঠা: ১১৪

২৫.https:*Youtube*/watch02/01/2020

"মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গলকাব্য" লেখার পর রবীন্দ্র সঙ্গীতের রাজা হিসেবে বিবেচিত গণনাট্য গ্রুপের প্রধান শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস কলকাতায় লাখ লাখ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে যখন গাইতেন তখন মানুষ যেমন আনন্দ পেত তেমনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তনে এই "মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গলকাব্য" রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ভারতীয় শিল্পী ভূপেন হাজারিকা রচিত মূল অসমীয়া গানটির বাংলা অনুবাদ করেন ভাটি অঞ্চলের সঙ্গীতের প্রবাদ পুরুষ হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

প্রতিধ্বনি শুনি প্রতিধ্বনি শুনি
মোর গায়ের সীমানায় পাহাড়ের ওপারে
নিশীথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি!![২৬]

হেমাঙ্গ বিশ্বাস মনে প্রানে বিশ্বাস করতেন ভাটিয়ালী গান হল- 'শ্রমজীবি মানুষের বঞ্চনার অভিব্যাক্তি, সেখানে মিশে থাকে তাদের ঘাম, কান্না, জীবনের অসীম আকুতি ও আশাবাদ। ঠিক এই কথা গুলো আমি বলতে চাই গবেষণায়। ভাটি অঞ্চলের গান সম্পর্কে পল্লিকবি জসিমউদ্দিন ও একই অনুভূতি ব্যাক্ত করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস গানের বাহিরানার কথা বলেছেন এই জন্য যে গানের শুদ্ধতা যেন বজায় থাকে ও আঞ্চলিকতা যেন অক্ষুণ্ন থাকে।

তিনি বলেছেন 'সঙ্গীতের উচ্চারণকে মার্জিত করা শহরে বসে কথা বানানো সুরের ও গায়কীর যেমন ইচ্ছে পরিবর্তন ঘটানো একটা আধিপত্যকারী সংস্কৃতির তরফে সরাসরি আক্রমন সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির ওপর। একদিকে তাদের আশ্রয় ও অন্ন কেড়ে নেয় যারা

তারাই এভাবে তাদের সংস্কৃতি ও কেড়ে নেয় বেমালূম পাল্টে ফেলে। তাই আঞ্চলিক শুদ্ধতা বজায় থাকতে হবে সংগীতে কারণ একটি সমাজের অঞ্চলের বাস্তবজীবনের ব্যাথা ও কথা, নদী ও নৌকা প্রকৃতি ও শ্রম নিয়েই রচিত হয়  ভাটিয়ালী গান।

---

২৬.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সমগ্র-১*; (কলকাতা: দে'জ, ২০১২) পৃষ্ঠা: ১৫৪

**রাধানাথ রায় চৌধুরী**[২৭]: রাধানাথ রাম চৌধুরী মৌলভীবাজার কুলাউড়া থানার টিকরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বৈদ্যনাথ রায় চৌধুরী। বিভিন্ন দেব-দেবীর ক্ষমতা ও কৃপা অবলম্বনে নারী সংগীত রচনা করেন তিনি । তার এই সংকলনের নাম 'রাধানাথ সাংগীত। এই সংকলনে তাঁর ১৪৯ টি গান রয়েছে। ১২৮৯ বাংলা সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর এই সংকলনটি স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণযোগ্য। প্রস্তাবিত মৌলভীবাজার ল কলেজের প্রভাষক শাহিদা আফরোজ একজন সঙ্গীত পিপাসু ব্যাক্তিত্ব। মরমী সুর শিল্পী হাছন রাজার সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর সাথে আলাপকালে তিনি বলেন মৌলভীবাজারের রাধানাথ রায় চৌধুরীর মতো

আরো অনেক গুণী গীতিকার ও সুরকার আছেন। তাঁদের গান নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত, অন্যথায় কালজয়ী এসব গান হারিয়ে যাবে সংরক্ষনের অভাবে।

**রাধারমন দত্ত** (বাংলা ১২৪০-১৩৩৯)[২৮]: সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার কেশবপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। রাধা রমন দত্তের পিতাও প্রখ্যাত গীতি কবি ও বাউল ছিলেন। জয়দেবের বিখ্যাত 'গীত গোবিন্দ' বাংলাভাষায় সর্ব প্রথম অনুবাদ করেন রাধা রমন দত্ত। ভ্রমরগীতিকা ভারত সাবিত্রী সূর্যব্রত পাঁচালী, পদ্মপুরাণ, কৃষ্ণলীলা রচনা করেন। রাধারমন পিতার মতো একজন প্রসিদ্ধ কবি হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেন। তাঁর বংশীয় এক পুরুষ চক্রপানি দত্ত ছিলেন রাজ গৌরগোবিন্দের রাজবৈদ্য। ৫০ বছর বয়সে রঘুনাথ ভট্টাচার্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সংসার ত্যাগী হন । নীলুয়ার হাওরের নির্জন একস্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠ করে তথায় বসে গান রচনা শুরু করেন। তার ভক্ত অনুরাগীদের মুখে মুখে তার গান বেঁছে আছে কিন্তু কালে কালে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। হাছন রাজা তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন । তার গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার । কিন্তু কালের স্রোতে এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে তাই তিনি লিখে ছিলেন:

**আমার সাধনার ধন হইল চুরি, আমি কার পানেতে চাইরে**

প্রায় ৫০ বছর বয়স তিনি ইঠার ঢেউপাশার রঘুনাথ ভট্টাচার্যের নিকট উপস্থিত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ প্রেমে পাগল এই রাধারমন

স্ত্রী পুত্র সংসার ত্যাগ করে হাওরের মধ্যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচুর শিষ্য ছিলো। তাঁর বাউল গানগুলো 'রাধারমন সংগীত' নামে পরিচিত। সিলেট, কাছাড়, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহে ''ভাইবে রাধারমন বলে" ভনিতা সংগীত খুব প্রচলিত ছিলো। মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন 'হারমনি' গ্রন্থে ৭ম খণ্ডে রাধারমনের ৫১ টি গান অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর অন্যতম একটি গান হলো-

আমার ভব জ্বালা গেল না সৎ পীরিত হইলনা ।
'এগো সৎ পীড়িত হইতে পারে মাটির দেহয়ে টিকবে না ধূয়া।
মুখের মাঝে অমৃত ভরা তাতে ছাই দিও না।
এগো দুধের মাঝে ছাঁই মিশাইলে দুধের বর্ণ রবে না[২৯]।

এখানে রাধারমন প্রেম কে সৎ হিসাবে দেখেছেন।এই প্রেমকে কুলসিত করে এমন মানসিকতার আবির্ভাবে প্রেম আর প্রেম থাকে না হয় প্রতারণা। তাই তিনি বলেছেন- 'এগো দুধের মাঝে ছাই মিসাইলে দুধের বর্ণ রবে না'। সামাজিক অবস্থার কুলসিত প্রেক্ষাপটে তিনি এই কবিগান রচনা করেন।

আমার সাধনার ধন হইল চুরি
আমি তার বলিতে চাইরে।[৩০]

২৭.মোহাম্মদ মুমিনুল হক; *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*; (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০) পৃষ্ঠা: ৪৯৮
২৮.মোহাম্মদ মুমিনুল হক; *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*; (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০) পৃষ্ঠা: ৪৯৯

সংগ্রহের অভাবে এই চুরি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর গানগুলো ছিলো অনেকটা ধামাইল আঙ্গিকের ।

রাধারমন দত্তের একটি প্রখ্যাত  গান হল-

প্রাণ বন্ধু বলিয়া, আইলনা শ্যাম কি দোষ জানিয়া

বড় লজ্জা পাইলাম নিকুঞ্জে আসিয়া।

প্রাণবন্ধু আসবে করি দুয়ারে দিলাম দড়ি

এ গো আইলো না শ্যাম নিশি যায় পুহাইয়া।

হাছন রাজা ও রাধারমনের মধ্যে আদান -প্রদানকৃত একটি ছন্দ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

রাধারমন

তুমি কেমন?

আমি তোমায় দেখতে চাই।

রাধারমন ছিলেন হাছন রাজার সমসাময়িক। মরমী এই বাউলশিল্পী ২০ শতকের আর্থ-সমাজিক প্রেক্ষাপটে তার গান গুলো রচনা করেন। তার গানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। সংগ্রহের অভাবে তাঁর গানগুলো বানের স্রোতে হারাতে বসেছে। এই গানগুলো পূনরুদ্ধার করতে হবে। ভাটির গানের এই রচয়িতার গান বিনোদনের জগতে বিশাল বড় ভূমিকা রাখবে এতে কোন সন্দেহ নেই।মরমী এই বাউল শিল্পী ১৯০৭ সালে পরলোক গমন করেন।

---

২৯.মোহাম্মদ মুমিনুল হক; *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত,* (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০) পৃষ্ঠা:৪৯৯

৩০.আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন; *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য;* (ঢাকা: জালালাবাদ এসো.শন, ১৯৯৫) পৃষ্ঠা: ৭৩

সৈয়দ শাহনূর (১৭৩০-১৮৫৫)[৩১]: মরমী এই কবির জন্ম হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানাধীন জালালপাশা গ্রামে।'নূরনসিহত নামা' নামে তার একটি গানের বই প্রকাশিত হয় ১৮১৯ সালে । তিনি সারি গানের অনেক প্রসার ঘটান এই অঞ্চলে । রাগনূর, 'নূরের বাগান' নামে আরো দু'টো বিখ্যাত গ্রন্থ আছে । তাঁর এ সারি গানের মধ্যে অন্যতম একটি হলো:

পাক পানি চিনিয়া নাও বাইও রে,

ওরে আমার হাউসের নাইয়া

বাছিয়া বাছিয়া পাইক তুলি ও নাও বাইব যারা

লুচ্চা গুন্ডা পাইক তুলিলে না ও মারিবো তারা

২৪০টি গান সমৃদ্ধ 'নূর নসিহত নামা

তুমি চিনলায় নারে মন-

এক মন্দিরে বাসা না হইল মিলন।

তাঁর পরিচয় তিনি নিজে দিয়েছেন এভাবে:

কহে বিবি সামিনা বানু শাহা নূরের তিরি (স্ত্রী)

মুর্শিদের লাগিয়া আমি দিবানিশি ঘুরি।

নূর নসিয়ত নামা পুঁথিটি মুদ্রিত হয়েছে কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। তাঁর ভক্তজনের মধ্যে একজন এ গুলোকে বাংলায় অনুলিপি করেন। এটি মূলত সিলেটী নগরী লিপিতে লিখিত ছিল। নসিয়ত নামার আরেকটি পুঁথি হল এ রকম-

কেউ যদি চায় এই পুঁথি লিখিবার
তারা লেখিয়া পুঁথি করিবে শুল্কার
পয়ার থৈয়া যেই জনে রাগ নিতে চাইব।
নিশ্চয় জানি ও তার বুরু ছিয়া টৈহব।
তবে যদি চাও কেউ ভাঙ্গি লেখিবার
আউয়ালে আঘেরে সেই হইব গুনাহগার।

---

৩১.দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী; *সিলেট বিভাগের ইতিহাস*; (ঢাকা: দশদিশা, ২০০৬); পৃষ্ঠা: ২০৩

তিনি মূলত সুফি মতবাদের সমর্থক ছিলেন তৎকালীন সমাজে সুফিবাদের একটা জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। তাঁর লেখনিতে তাঁর সুফি মতবাদ সমর্থনের  ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম সৈয়দ রুকুন উদ্দিন এর বংশধর । ভাটি অঞ্চলের গানের অন্যতম একটি অংশ হল পুঁথি। শাহনূরের পুঁথি গুলো সংগ্রহ করা তাই একন্ত জরুরি। তার গ্রামের এক গান পাগল তরুণকে জাবের হোসাইনকে তাঁর গান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি একমত হন যে সৈয়দ শাহনুরের গানগুলোরও বাহিরানা প্রয়োজন। তাহলে পুরো দেশে বিনোদনের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা রাখবে শানূরের

পুঁথি গানগুলো। তাই তাঁর মতে এসব গানের সংরক্ষণের ওপর সরকারী উদ্যোগ বেশি প্রয়োজন।

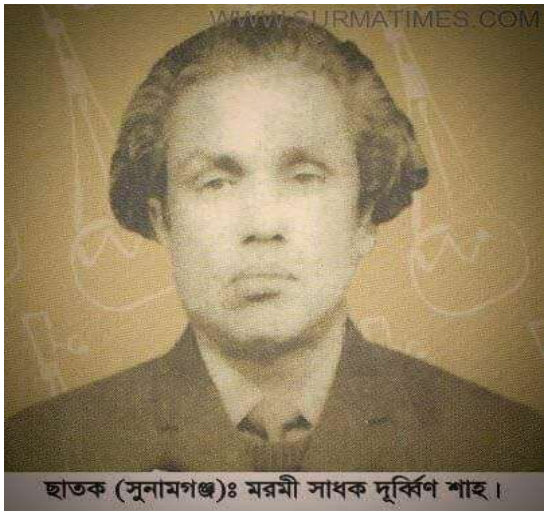

ছাতক (সুনামগঞ্জ)ঃ মরমী সাধক দূর্ব্বিণ শাহ।

দুর্বিন শাহ[৩২]: বাউল গানের রচয়িতা দুর্বিন শাহ ছাতকের দুর্বিন টিলায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালে। তিনি ছিলেন বাউল গানের রচয়িতা ও গায়ক। গান নিয়ে তাঁর একটি সংকলন আছে, যার নাম 'প্রেম সাগর' । পাঁচ খণ্ডের এই সংকলনে এক হাজারের মতো গান আছে। তাঁর গান শুধু সুনামঞ্জে নয় পুরো দেশে সমান ভাবে সমাদৃত। তাঁর বাউল গানে তাঁর অন্যতম একটি জনপ্রিয় গান হলো-

পিরীতি কি গাছের গোটা

জীয়ন্তে হইয়াছে মরা যে লাগল প্রেমের লাটা ।

মজনু পাগল লায়লীর জন্য বাদল কত বনে বনে গো.....

কলংকিনী ত্রিভুবনে, যে দেখে করে ঠাট্টা

জুলেখা ইউসুপ না পাইয়া, ঘর বাড়ী ত্যাজ্য করিয়া গো

মিছিরে গেল চলিয়া হইল কত কুলুটা।

---

৩২.মোহাম্মদ মুমিনুল হক; *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত;* (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০) পৃষ্ঠা: ৪৭৯

৩৩.দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী; *সিলেট বিভাগের ইতিহাস;* (ঢাকা: দশদিশা, ২০০৬) পৃষ্ঠা: ২০৮

দুর্বিন শাহের গানে দেহ তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, মারফতি, মুর্শিদি, ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গাওয়া কিছু পল্লীগীতি ও রয়েছে। দুর্বিন শাহ ১৯৭৭ সালে মৃত্যু বরন করেন। তাঁর গান গুলোতে সামাজিক কর্মকান্ডের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায় । বিনোদনের অনাতম একটি মধ্যম হিসাবে তাঁর গানুগলো দেশেই সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর গানের সংকলনটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি।

<u>দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী (১৮৮৯-১৯৬৪):</u>

খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী হাছন রাজার পুত্র। হাছন রাজা মোটেও বৈষয়িক চরিত্রের ছিলেন না । কিন্তু একলিমুর রাজা চৌধুরী অতি মাত্রায় বৈষয়িক ছিলেন। কিন্তু পিতার মত কাব্যচর্চা করতেন। তাঁর মাতার নাম সাজেদা বেগম। তিনি সুনামগঞ্জেই পড়ালেখা করেন। তার লিখিত প্রায় তিনশত কবিতা ও আড়াইশত গান রয়েছে[৩৪]। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও তার কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গানের বইটির নাম- গীতি মেঘলা। ‘গীতি মেঘলা’র একটি গান এখানে তুলে ধরা হলো-

ও পাখি কই ও বন্ধুয়ার নাগাল পাইলে
ফিরিয়া যদি আসে ঘরে
একলিম রাজা মইলে
পাখি কইও বন্ধুয়ার নাগাল পাইলে

কই ও কই ও কইও রে পাখি কইও বন্দের ঠাই

একলিম রাজা মইরা গেছে এ জগতে নাই

১৯৬৪ সালের ৭ জুন বিলেতে যান চিকিৎসার জন্য ইংল্যান্ডের পোর্ট মাউথ হাসপাতালে ১৩ই আগষ্ট ইন্তেকাল করেন। মৃতদেহ রামপাশার পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হয়।

তাঁর গান ভাটির গানের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছে। বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে এসব স্থানের সংগ্রহশালা থাকা উচিৎ। দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী গানের সংগ্রহ আমাদের বিনোদনের ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্দ করবে।

---

৩৪.মোহাম্মদ মুমিনুল হক; *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত;* (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০) পৃষ্ঠা: ৪৮০

<u>গোলাম হুছন:</u> কুলাউড়া থানার লস্করপুর্বগ্রামে বাংলার আরেক মরমী পুরুষ ,যার নাম গোলাম হুছন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ নূর। গোলাম হুছন ৩০০ পৃষ্ঠার এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। এতে ২৮ টি তত্ত্ব কথার গান রয়েছে। এসব গানের বিষয়বস্তু হল তরিকত, হকিকত, শরিয়ত ও মারিফত ইত্যাদি । তার একটি এখানে তুলে ধরা হলো:

আবের পাত্তন ঘরে খাকের বদন

তার মাঝে খেরা করে শ্যাম নিরঞ্জন।

পবনে চালাইয় দাগ আতসের পানি

রসের ঠিকনী ঘর মোমের গাথুনী[৩৫]।

গোলাম হুছন সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

দেওয়ান গনিউর রাজা চৌধুরী (১২৮৩-১৯৩৯):

দেওয়ান গনিউর রাজা চৌধুরী হাছন রাজার প্রথম পক্ষের সন্তান, তাঁর মায়ের নাম ভোরজান চৌধুরী। দেওয়ান গনিউর রাজা চৌধুরী সুনামগঞ্জ, সিলেট ও কোলকাতায় পড়াশোনা করেন। পিতার মতো তারও সাহিত্যে ব্যাপক প্রতিভা ছিল। তাঁর লিখিত অনেক গান রয়েছে। তাঁর গানের সংকলনের নাম- 'গনিসংগীত'। গনি সংগীত প্রকাশের পর মুহাম্মদ আব্দুল হাই আবার তা পুন: প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত কারনে আব্দুল হাই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে পরে । দেওয়ান গনিউর রাজার ডায়রীতে তাঁর অনেক কবিতা ও গান রয়েছে। তাঁর ডায়রির লেখাগুলো ও প্রকাশিত হওয়া উচিৎ। তার ডায়রি থেকে একটি গান উদ্‌ধৃত হল -

আমার প্রাণ যারে চায়,

তারে পাশরিলে পাশার যায়

পাঙ্গার না যায় নো সখি, করি কি উপায়।

যদি মুদি আঁখি ও প্রাণ

সখি হৃদয় মাঝে দেখি বসলঙ্গ যায়

আমার হৃদে বসে প্রাণ নাথে মুরলি বাজায়

ভাটির গানের প্রাণ পুরুষ এই শিল্পীর প্রতিটি গান সংরক্ষণ করে

মুদ্রণ করতে হবে।

৩৫.মোহাম্মদ মুমিনুল হক; *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*; (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০) পৃষ্ঠা: ৪৭৬

জনাব মুনাওর আলী (১৮৮৬-১৯৫১): ভাটি অঞ্চল খ্যাত সুনামগঞ্জের স্বনামধন্য সাহিত্যরসিক জনাব মুনাওর আলী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৬ সালে। রাজনৈতিক জীবনেও তিনি ছিলেন সফল। মন্ত্রী থাকাকালীন সময় ও ব্যস্ততার মাঝেই সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর তিনটি গ্রন্থ রয়েছে-

১। বাংলা আমাপাড়া,

২। জিলওয়া

৩। *An Outline of Pakistan Constitution*[৩৬].

তাঁর গান ভাটি অঞ্চলের ব্যাপক ভাবে সমাদৃত।

বিনোদন জগতে তার কিছু গান খুবই বিখ্যাত,

তার মধ্যে একটি এখানে তুলে ধরা হলো:

রঙ্গিলা নাওয়ের নাইয়

আগে যাইসনারে নাও বাইয়া

ঝিলমিল ঝিলমিল করে

ওরে এই আকাশের পাড়ে

দাড়ি মাঝি আছে যতো হইয়াছে সব আবানত

আকাশ পানে চাইয়া

আগে যাইসনারে নাও বাইয়া।

তিনি মৌলভী মুনসুর আলী নামেই বেশী পরিচিত। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল ভাটি অঞ্চলের অন্যতম আরেক জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শাহবাজপুরে। পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডাকসাইটে আইনজীবী। সুনামগঞ্জ জেলায় কোন মুসলমান আইনজীবী না থাকায় তৎকালীন S.D.D এর অনুরোধে তাঁর পিতা মুশারফ আলী সুনামগঞ্জে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মৌলভী মুনসুর আলীর শৈশব সুনামগঞ্জে কাটালেও বি.এ পাস করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মীড়াট কলেজ থেকে। মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে আইনে ডিগ্রী লাভ করে সুনামগঞ্জ বারে যোগদান করেন।

---

৩৬.আলী সাজ্জাদ হোসাইন; *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*; (ঢাকা: জালালাবাদ এসো: ১৯৯৫) পৃষ্ঠা: ৯২

তখন থেকেই তিনি রাজনীতিতে বেশি সময় দিতে থাকেন। তিনি পরপর দুবার M.L.A (Member of Legislative Assembly) নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনদরদী ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর (From British Raj to Swaraj) পুস্তকে এর পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্য ও গান রচনায় তার সমান দক্ষতা ছিলো। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের সংগীত প্রেমী মো: মক্তবুর রহমানকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং তাঁর কিছু গানের কথা আমাকে বলেন। তিনি আরো বলেন

মুনাত্তর আলী গানের ওপর গবেষণা হলে তাঁর সম্পর্কে দেশবাসী জানতে পারবে।

ভেটু শাহ: ভাটি অঞ্চলের বিখ্যাত বাউল সাধক শাহনুরের অন্যতম শিষ্য ভক্ত ছিলেন ভেটু শাহ। গুরুর মতো শিষ্যেরও গান রচনায় ব্যাপক আধিপত্য ছিলো। তাঁর গান আজো সুনামগঞ্জবাসীর মুখে মুখে। তার একটি বিখ্যাত গান-

দুঃখ কৈমু কোন বাসর

মা অইয়া পুতার যে করে দুই নজর[৩৭]।

তাঁর আরেকটি জনপ্রিয় গান হল এ রকম -

বন্ধু যদি না আ ওরে ,অভাগিনীর মাথা খাও রে।

একেলা মন্দিরে থাকি

শুইলে স্বপনে দেখি পোহাই নিশি, কান্দিয়া কান্দিয়া

এসে পরান রাখ আমার, দরশন দিয়ারে

ফুল শয্যা শূন্য করি।

কোথায় রইলারে প্রানের হরি

ঐ যে দুঃখে করিয়া মরি হেরিয়াছি

হেরিয়াছি আমি পীরিতের কালারে

৩৭.আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন; *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: জালালাবাদ এসো. ১৯৯৫) পৃষ্ঠা: ৮৩

ভাঙ্গিমু হাতেরই শাখা

ছিড়িমু গলারই হার

যথাযথা যাইমুরে চলিয়া

মরিমু মুরিমু আমি জলে ঝাপে দিয়ারে

আরে ঘরে আতশের ছানি

সোনা মুর্শিদ গুনমনি ঘরে

বইছইন মুর্শিদ ফুলটঙ্গিঁ ঘরে

সখিরে মিনতি করে, ভেটু শাহ ফকিরে।

মো:মোশারফ হোসেন: সাধক কবি মো:মোশারফ হোসেন বাংলা ১৩১৬ সালে কমলগঞ্জ থানার রহিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জাওয়াদ উল্লাহ মরমী এই কবি পাঁচ শতাধিক গান রচনা করেন। ১৩৬৪ সালে মৃত্যুবরন করেন। তাঁর গান সম্পর্কে কোনো তথ্য তার জেলার কোনো  ইতিহাস গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শাহ আছদ আলী: (১৮১৩-১৯০৫) ১৮১৩  সালের অর্থাৎ বাংলা ১২২০ সালের ১ লা আষাঢ় সুনামগঞ্জের ষোল ঘর মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন শাহ আছদ আলী। তিনি অনেক ইসলামী পুঁথির রচয়িতা। তাঁর অন্যতম পুথিঁ বিষয়ক গ্রন্থটি হল- ‘পুঁথি শহর চরিত’। সুফি শাস্ত্র বিষয়ক

আরেকটি পুঁথি গ্রন্থ হল - "অগাজ পুঁথি এবাদতের মগজ" অত্যন্ত জ্ঞান পিপাসু ছিলেন শাহ আছদ আলী। জ্ঞান অন্বেষনে বিভিন্ন সুফি সাধারনের দ্বারে দ্বারে ঘুড়েন তিনি।

তিনি সুনামগঞ্জ শহরে অবস্থান কালীন সময় প্রচলিত সিলেটী নাগরী অক্ষরে বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করেন। গ্রামের বাড়ির মসজিদে বেশিরভাগ সময় অবস্থান করতেন তিনি। মসজিদে বেসে বিভিন্ন ইসলামী গান ও কবিতা লিখতেন এবং মুরিদদের নিকট প্রচার করতেন। এখনো মুরিদের কাছে তাঁর গান শুনতে পাওয়া যায়। ১৯০৫ সালে ইন্তেকাল করেন তিনি। তাঁর গানগুলো সংরক্ষিত আছে তাঁর মুরিদগনের মুখে মুখে। তিনি বলেন- "শাহা আছদ আলিয়ে কয় না হৈয়া বর, পরগনাতে লক্ষণছিরি বাড়ি ষোলঘর।"[৩৮] কালে কালে হারিয়ে যাচ্ছে তার লেখা গানগুলো।

---

৩৮.দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী; *সিলেট বিভাগের ইতিহাস*, (ঢাকা;দশদিশা, ২০০৬) পৃষ্ঠা: ২০৭

শাহ আব্দুল ওহাব: (১৭৬৩-১৮৮৮) ভাটি অঞ্চল খ্যাত সিলেট নগরের ফূলবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এক প্রখ্যাত পুঁথি লেখক, যাঁর নাম শাহ আব্দুল ওহাব। তাঁর রচিত 'পুঁথি ভেদাকায়া'র কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হল।

মওলানা মোহাম্মদ আজিম সর্বলোকে জানে

পূর্ব শহরের কুতুবী আল্লাহ দিয়া ছিলো তানে।

শরিয়ত মারিফতের বৃক্ষের ছিলো ফূর

ফূলবাড়িতে গদ্দি ছিলো আল্লার মকবুল[৩৯]।

তিনি নকশা বন্দিয়া তরিকার লোক ছিলেন। এলাকায় তিনি "মিয়া সাহেব" নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। শাহ আব্দুল বাদির ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু। আরবি, ফার্সি, বাংলা সব ভাষাতেই তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিলো । তৎকালীন সমাজে সিলেটে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। ধর্মের মূলসারবস্তু কথা তার পুঁথিতে পাওয়া যেতো। তৎকালীন সমাজের মানুষের কাছে তাঁর পুঁথি ছিলো বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। নকশা বন্দিয়া তরিকায় মতাদর্শী এই পুঁথি লেখক তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সামাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন। ১৮৮৮ সালে এই মহান পুঁথি লেখক মৃত্যু বরণ করেন তাঁর পুঁথিগুলো আমাদের অচিরেই সংরক্ষণ করতে হবে, তা না হলে এই পুঁথিগুলো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

শাহ দ্বীন ভবানন্দ: মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার লংনা পরগনার নর্ত্তন গ্রামে জন্মগ্রহণ করে এক মহান আধ্যাত্মিক গানের রচয়িতা যাঁর নাম শাহদ্বীন ভবানন্দ। ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি। তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো ভবানন্দ ভট্রাচার্য। তিনি বিদ্যান ও শাস্ত্রভিজ্ঞপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বেশি বয়সে বিয়ে করেন এবং স্ত্রীর প্রতি ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে কখনো বাবার বাড়িতে যেতে দিতেন না।

---

৩৯.মোহাম্মদ মুমিনুল হক; *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*; (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০) পৃষ্ঠা: ৫০১

একবার ভবানন্দ বাড়িতে না থাকায় তাঁর মা তাঁর স্ত্রীকে তাঁর বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে না দেখে তিনি হাওর পথে শ্বশুর বাড়ী রওনা দেন সেখানে পৌঁছাতে তাঁর কয়েকদিন লেগে যায়। তাঁর  স্ত্রী তাঁর এই অবস্থা দেখে বলেন -

“আমার জন্য এমন পাগল না হয়ে যদি ঈশ্বরের জন্য এমন পাগল হতে তবে তোমার জীবন সার্থক হতো।”

এ কথা শুনে ভবানন্দ সত্যি সত্যিই ঈশ্বর পাগল হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান, নদী হাওর, খাল-বিলে জীবন যাপন করে বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক গান রচনা করেন। প্রায় ২৪০ টি  গান নিয়ে "রাগ হরিবংশ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় আরো অনেক গীতিকার আছেন যাঁদের মধ্যে অন্যতম সুজানগর বাড্ডা গ্রামের সিরাজ উদ্দিন। তিনি একজন চারণ কবি। তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষা নেই। মুখে মুখে ছন্দ রচনা করেন তিনি। বর্তমানে তিনি গান রচনায় বেশি মননিবেশ করেছেন।[৪০]

সুফী শিতলং শাহ (১৮০০-১৮৮৯): সুফী শিতলং সিলেট জেলার গৌরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো মোহম্মদ ছলিম। তার পড়াশোনা ছিলো মাদ্রাসা কেন্দ্রিক। মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কালে তিনি অধ্যাত্মিক বিষয়ে পারদর্শী হন। তিনি ইলমে মারিফতের অনুসারী হয়ে

অনেক ইসলামী গান রচনা করেন। তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন নিম্নোক্ত গানে;

শিতালং নাম মোর গুনাহ বেশুমার
কৃপা যদি কর আল্লা করিম গফফার।

মোহাম্মদ সলিমুউল্লাহ দোষগুণে মাজুর

জাঁহা বকশ আলী নাম পিতার মাশুর।

---

৪০.এম এইচ ফরহাদ খান ও অন্যান্য; *বড়লেখা অতীত ও বর্তমান*; (ঢাকা: বাংলাদেশ রাইটার্স গিল্ড, ২০০০) পৃষ্ঠা: ১১০

পরগণে চাপঘাট মোর পয়দিশ সেথায়

শ্রীগৌরী মৌজায়েতে, শিলচর কিত্তায়[৪১]।

ভক্ত কুলের মাঝে তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি গান হলো -

আল্লাজী, ভবের মায়া মজি কইলাম রংঢং

বিপাকে ঠেকিয়া কান্দইন ফকির শিতলং[৪২]।

বিবাহের পর সুফী শিতলং শাহ শ্বশুরালয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। জীবনের প্রায় ১২ বছর তিনি পাহাড়ের নির্জনে দিনাতিপাত করেন। আরাধনা করতে করতে সলিম হয়ে গেলেন সুফী শিতালং শাহ।

শিতালং শব্দের অর্থ পায়ের গোড়ালী। বিনয়ের অবতার এই সুফী সাধক নিজেকে আল্লাহর প্রেমে নিবেদিত করে নাম ধারন করেন শিতলং। তিনি তাঁর তিন পুত্রের কাছে বলে যান তার কবর যেন পাকা করা না হয়। তারপরও কেনো যেন ভাঙাবাজার রেল ষ্টেশনের কাছে তাঁর মাজার আছে। সুফী শিতলং শাহের লেখা বিপুল সংখ্যক গান পাওয়া যায় তাঁর একটি গ্রন্থে যা তিন খন্ডে বিভক্ত। তাঁর অন্যতম ভক্ত ছিলেন - ফকির ভেলা শাহ ও শাহ মোঃ ইয়াছিন। তাদের মুখে মুখেই গান গুলো বেশি পরিচিতি পায়। খণ্ড তিনটির নাম হলো-

১ম খন্ড -'মুশকিল তরান'

২য় খন্ড- 'কিয়ামত নামা'

৩য় খন্ড - 'রাগ বাউলা।'

বেনামাজী গনের প্রতি তিনি যে গানটি বেশী গাইতেন তা হলো-

তোরা দেখবে তায়

শুনবে রে হায়

বেনামাজী মারা যায়

---

৪১.দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী; *সিলেট বিভাগের ইতিহাস*; (ঢাকা;দশদিশা, ২০০৬) পৃষ্ঠা: ২০৫

৪২.মোহাম্মদ মুমিনুল হক; *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*; (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০) পৃষ্ঠা: ৫০২

গ্রাম নষ্ট কইলরে চোরায়
বেনামাজী হাটিয়া যাইতে

ভয় - ডর নাই,

ওরে কিলা যাইত, কিলা রইত সর্বদা সেই আন্দোসায়ে

কেউ যদি বলে তারে রে

ও মুমিন নামাজেতে আয়রে আয় ।

ওরে গোছল আমি করছি না রে

কাপড় আমার ভালা নয়।

বেনামাজী হারামজাদা ও মুমিন

মুখেতে তার শিরি নাই।

ওরে কথা কইতে টেঙ্গা লাগে কাপড় গন্ধে মগজ ছাই

নষ্ট কইলরে চোরায়।

শিতলং

বৃথা আইলাম দুনিয়ায়

ওরে আল্লা  বল ভাইরে তরাইবা ইল্লালায়।

১৮৮৯ সালে এই সুফী সাধক মৃত্যুবরণ করেন। সিলেট নিবাসী এ্যাডভোকেট এ, কে, এম, উবাইদুল হক (উবায়েদ) এর সাথে তাঁর

এলাকার গুণীজন শিল্পীদের নিয়ে কথা হয়। তিনি বলেন- সিলেটের বেশিরভাগ গীতিকারই আধ্যাত্মিক ধাঁচের গান রচনা করেছেন বেশি। তাদের মধ্যে সুফী শিতলং শাহ অন্যতম। মরমী এই শিল্পীসহ সিলেট অঞ্চলের গুণী শিল্পীগণের গান বেশি করে গাওয়া হলে প্রচারও হবে বেশি। আর গবেষণা হলে সংরক্ষিত হবে সেসব কালজয়ী গান।

খায়রুল আলাম বাদল

খায়রুল আলাম বাদল: প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, গণ সাংস্কৃতিক দল, সংগ্রাহক ও উপস্থাপক, গবেষক। তাঁর কথা বলার সময় ভাটি অঞ্চলের গান সম্পর্কে তিনি যা বলেন তা, হল নিম্নরুপ:

তিনি তার নিজ জেলাকে বলেছেন

হাওর-বাওর খাল-বিল ভরা চৌদিকে যে জল
নিকলী থানা কিশোরগঞ্জের পূর্বেরই অঞ্চল

নিজের জেলার পরিচয় তিনি এভাবেই ধরে তোলেন, এর পর শুরু হয় তাঁর

গীতিকার ও সুরকার আমরশীল ও অখিল ঠাকুর যশোদল, কিশোরগঞ্জের বাসিন্দা। এই গানটিকে গায়ক বাদল ব্যাখা দিয়েছেন এভাবে একজন বাউলের উদাস মানসিকতার জন্য গৃহকাজে

মনোনিবেশ না করতে পারার কথা বলেছেন। তা নিজের দেহকে তুলনা করেছেন লাউয়া, অর্থাৎ একটি বাদ্য যন্ত্রের সাথে। (আমি আমার আলোচনা আগেই উল্লেখ করেছি ভাটির গানের সাথে আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ববাদ আছে) লাউয়ার তিন তার বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে- লাউকে যখন শুকিয়ে বাদ্য যন্ত্র বানানো হয় তখন দু পাশে বাঁশের কঞ্চি লাগিয়ে মাঝে তার বেঁধে শব্দের উৎস তৈরি করা হয় । বাউল সে শব্দের ঝংকারে উদাসী হয়ে গান বাঁধেন । দেহকে তিনি তিন অংশ ব্যাখা করেছেন। দুটো কঞ্চি হল তার দেহের কাঠামো আর মধ্যতার হল তার আত্ম বা হৃৎপিন্ড। এই হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে আমরা দম নিই, যাকে লালন সাই বলেছেন ‘অচিন পাখি’। তার গানে তিনি যেমন বলেছেন-

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
তারে ধরতে পারলে মনো বেড়ী, দিতাম পাখির পায়।

এই মধ্য তারের আনাগোনার মধ্যেই মানব জীবন আবর্তিত হয়। আর জীবন দানকারী যিনি মহান স্রষ্টা তার নাম ও গুণ বন্দনায় গীতিকার ব্যর্থ হয়েছেন বলে তার আপেক্ষ যে প্রেমরসে মধুর ও ঝংকারে আমি মধুর বঞ্চিত হইলাম গো।

গীতিকার ও সুরকার অমরশীলের আরেকটি প্রিয় গান যে গানটি গাইতেন গায়ক বিপুল ভট্রাচার্য-

গুরু উপায় বলো না,
জনম দু:খি কপাল পোড়া গুরু

আমি একজনা
গিয়েছিলাম ভবের বাজারে
ছয় চোরতে যে করলো চুরি
ধরলো আমারে ও গুরু গো চোরা চুরি কইরা খালাশ পাইলো

আমায় দিলো জেল খানায়
জনম দু:খি কপাল পোড়া গুরু

আমি একজনা।

আগে ছোট কালে মইরাছিলো মা
গর্ভে থুইয়া পিতা মরলো, গুরু চোখে দেখলাম না

ও গুরুগো, কে করিবে লালন পালন

কে করিবে তুলনা
জনম দু:খি কপাল পোড়া গুরু আমি একজনা।

শিল্পী বিপুল ভট্টাচার্য ছিলেন অমরশীলের শিষ্য। অমরশীল এর এই গানটি গেয়ে তিনি বিখ্যাত হন । অমরশীলের ও ছিলো দারুন গুরুভক্তি, তিনি বিভিন্ন গানে তার গুরু অখিল ঠাকুরের নাম নিয়েছেন। আবার এমনও কিছু গান আছে যা দুজনের রচনায় নতুন রুপ পেয়েছে। বর্তমানে গুরু শিষ্যের এই প্রেম খুঁজে পাওয়া দুস্কর। গুরু উপায় বল না গানটিও হয়তো দু জনেরই যৌথ সৃষ্টি যদিও আমি অমরশীল ছাপা অক্ষরে লেখা বইটিতে এই গানটি খুঁজে পাইনি।

কিন্তু গীতিকার খায়রুল আলম বাদল “চন্দ্রাবতী কথা চলচ্চিত্রের জন্য একটি গান রচনা করেছেন-“দড়ি ছিড়ে না’ ছিড়ে না-গেয়েছেন কিশোরগঞ্জের গায়ক শংকর দে।

মনের লগে (সাথে) মনের ডুড়ি ছিড়ে না টাইনা (টেনে)
ওরে যায় না ধরা
যায় না দেহা (দেখা)
মনে মনের জোড়া
বাতায় বাতায় যেমন ধরা
পানসি না ওয়ে গোড়া
একে ভাঙ্গে অন্যেও ভাঙ্গে রাইখো (রেখো) গো জাইন্যা (জেনে)।
ওরে ভানু বিনা দিনের ফসল
থাহে (থাকে) নারে যেমন
ফুল বীনা ভোমরা (ভ্রমর)রা (ভোমররারা)
বাঁচেনারে তেমন
সুজন রয়না সুজন ছাইড়া (ছেড়ে)
পিড়িত রীতি মাইন্যা (মেনে)।
দড়ি ছিড়ে না ছিড়ে না.....ছিড়ে না টাইন্যা।

ব্যাখ্যা-চন্দ্রাবতীর সাথে জয়দেবের প্রেমের প্রেক্ষাপটকেই গীতিকার তার গানে তুলে ধরেছেন্ চিরন্তন প্রেম কখনো ধর্ম জাত কূল মানে না, প্রেম তার চিরন্তন রীতিতেই চলে-

প্রেমের যোগাযোগে কখনো ডিভাইস লাগে না এটা সম্পূর্ণ একনিষ্ঠতার বিষয়। এখানে মন থেকে মনের ফ্রিকোয়েলিটাই আসল । যেমন গীতিকার বলেছেন-

ওরে যায় না ধরা যায় না

দেহা মনে মনের জোড়া

বাতায় বাতায় যেমন ধরা

পানসি নাওয়ের গোড়া।

একে ভাঙ্গে অন্যে ও ভাঙ্গে রাইখো গো জাইন্যা।

নিকলী থানা, অর্থাৎ কিশোরগঞ্জ জেলার ভাটি অধ্যুষিত থানার ‘গণ সংস্কৃতি’ দলের প্রযোজনায় পরিচালিত একটি জারী গান যার গীতিকার ও গবেষক খায়রুল আলম বাদল আমাদের গেয়ে শোনানঃ

নাম নিলে যার
দেশের না কয়
দেশের নিলে তার নাম কয়
বিশ্ব দরবার গেলে
এমনি কয়।

দেশ ও তিনি পরিপূরক।

বন্দনাতে তার-ই নাম।

তিনি মোদের জাতির পিতা

শেখ মুজিবুর রহমান।

এক আদর্শের নাম শেখ মুজিব

ভাইরে মুজিব মানেই চিরঞ্জিব।

জন্ম জন্মান্তরে জিও শেখ মুজিব

ভাইরে মুজিব মানে অভয় বাণী

মুজিব মানেই মুক্তির বাণী

মুজিব মানে বীর বাঙালি
মুজিব মানে স্বাধীন ভূমি
জন্ম জন্মান্তরে  জিও শেখ মুজিব।
আরে ফরিদপুরের টুঙ্গী পাড়ায় ১৯২০ সালের
১৭ই মার্চে একটি শিশু জন্ম গ্রহন করে
“খোকন” বলে মায়ে বাপে ডাকতেন আদর করে
বাঙালির শ্রেষ্ঠ নেতা সেই শিশু হয় পরে। জন্ম জন্ম জন্মান্তরে জিও
শেখ মুজিব।
আরে মুজিব যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে
রাজনীতির দায়ে তারে বহিস্কার করে
শাষক গোষ্ঠী ভাবে এবার যাবে বুঝি ঝড়ে
আপোষহীন নেতা বলে খ্যাতি গেলো বেড়ে।
জন্ম জন্মান্তরে জিও শেখ মুজিব।
আরে ৪৯ এ আওয়ামীলীগ গঠন হলে পরে যুগ্ম সম্পাদক হয়ে
আত্মনিয়োগ করে।
৫২ এর ভাষা আন্দোলন তুলে চাঙ্গা করে।
স্বাধীনতার বীজ এতে দেয় বপন করে।
জন্ম জন্মান্তরে জিও শেখ মুজিব।
আরে ৫৪ তে যুক্তফন্ট্রের নির্বাচন করে
প্রাদেশিক মন্ত্রী হয়ে শপথ গ্রহণ করে
মন্ত্রী হয়ে বারে বারে গেলো কারাগারে

ক্ষমতা দেয়নি কভু তালবহানা করে

জন্ম জন্মান্তরে জিও শেখ মুজিব।

আরে ৬৯ এ গণ অভ্যুত্থান হলে পরে

বঙ্গবন্ধু উপাধীটা তখনি লাভ করে

৭১ এর ৭ই মার্চে ঘোষণা করে

দূর্গ গড়ে তুলতে হবে সবার ঘরে ঘরে

জন্ম  জন্মান্তরে  জিও শেখ মুজিব (স্লোগান)

‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর

বাংলাদেশ স্বাধীন কর’

‘পদ্মা মেঘনা যমুনা

তোমার আমার ঠিকানা’

‘জয় বাংলা।’

আরে ৭১ এর সব দাবী এক হয়ে যায়

বঙ্গবন্ধুর ডাকে শুধু স্বাধীনতা চায়

বুকের তাজা রক্তে শেষে

হানাদার হটাই

স্বাধীনতা পেয়ে শেষে

জন্ম জন্মান্তরে জিও শেখ মুজিব।

আরে ৭২ এ আপন দেশে শেখ মুজিব ফিরে

বিদ্ধস্ত দেশ গড়তে মনোনিবেশ করে ।

৭৫ এর ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে কোনবা দোষে মারলো তাঁরে স্বপরিবারে।

(এক মিনিটের জন্য সকল বাদ্যযন্ত্র বন্ধ হয়ে করুণ সুর বেজে উঠবে এবং জারীর গানের গায়ক

নিজেদেরকে কালো কাপড়ে ঢেকে দেবেন।)

অর্থাৎ গীতিকার বাদল এখানে বুঝিয়েছেন

১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর জাতি যেমন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন।

এর দোহারগনের মাঝখান থেকে বয়াতী দাঁড়াবে এবং আবার গান ধরবে

কাঁদো কাঁদো বাঙালি জাতি
গেলো চলে দেশ স্থপতি
জাতি হে কোনবা দোষে করলো এমন ক্ষতি রে?
ও পাষাণ রে বুঝলি নারে ও পাষাণী
মুজিব মরে গেলে ও পাষাণ
আদর্শ রয় বাঁচী ও পাষাণ রে
এখন লক্ষ লক্ষ আছে মুজিব .. হায় হায়
বাঙালার ঘরে ঘরে রে।

বাঙালার ঘরে ঘরে ।

এর পর দ্রুত এই প্যারাটাই গাওয়া হবে।

গায়ক বাদলের মুখে অমর শীলের আরেকটি গানের কথা শুনি যা আমাদের গেয়ে শোনান হীমাংশু ভৌমিক (অমর শীলের শিষ্য)

আর কতকাল থাকবো বন্ধু
আমি পরের ঘরে
মরমীয়া বন্ধুরে
আমি পরের অধীন হই চিরদিন
থাকি পরের বেশাত পরে
মরমীয় বন্ধুরে.....
আমার পরের চাকরী করাইলো
ঘোর সংসারী বানাইলেরে
ওরে মায়া পাশী গলায় দিয়ে
রাখলে ফাঁসি ধরে
মরমীয়া বন্ধুরে দরদীয়া বন্ধুরে
তুমি বীনে আর কে আছে
আর ডাকিবে কারে
একে আমর জীর্ণ তরী
কখন জানি ডুইবা মরি রে
অমরের ভাঙ্গা তরী তরাইয়া নেও মোরে
মরমীয়া বন্ধুরে.....আর কতকাল থাকবো বন্ধু আমি পরের ঘরে।

গুরুর কথা বলতে গিয়ে গায়ক অস্ত্রুসজল হয়ে পরেন। আজকাল এমন গুরু ভক্তি দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি চান তাঁর রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার হোক। তিনি তাঁর গুরুর গান মৃত্যু অবধি গাইতে চান।

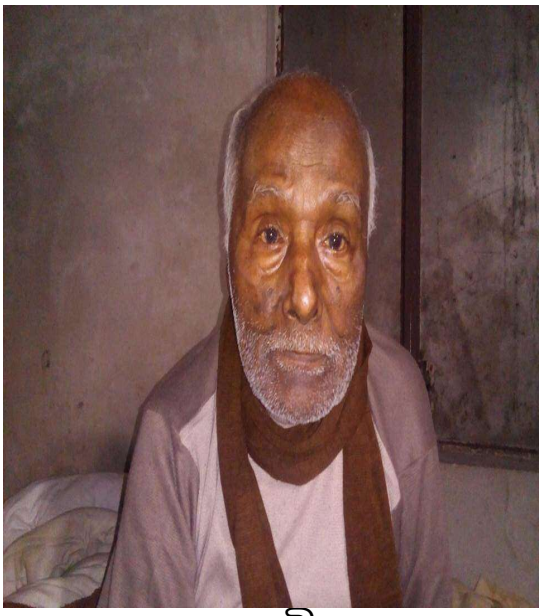
অমরশীল

গীতিকার অমরশীল: বাংলা ১৩৩৮ সালে যশোদলের বীর দামপাড়া গ্রামে জগন্নাথ শীলের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় বর্তমানে দিনাতিপাত করছেন। বার্ধক্যের স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝে হাতেরে বেড়ান। আমি যখন আমার ভাইকে নিয়ে তার বাড়িতে যাই। আমাদের পেয়ে অনেক খুশি হন। অনেকগুলো দাঁত না থাকায় তাঁর কথাগুলোও স্পষ্ট নয়। তবে তিনি বুঝতে পেরেছেন আমরা তাঁর খোঁজেই এসেছি।

আমার ভাই মোবাইল ফোনে ধারন করা তাঁর লেখা, হীমাংশু ভৌমিকের গাওয়া গানটি বাজিয়ে শোনায়, তখন ডুকরে কেঁদে উঠেন তিনি, স্মৃতি খুঁজে বেড়ান। বার্ধক্যের জন্য এখন গানও গাইতে পারেন না। তার গানগুলো যদি এখন আর গাওয়া না হয়, প্রচার না হয় তবে কালের

স্রোতে বিলীন হয়ে যাবে বলে আমার আশঙ্কা। তাই আমার গবেষণার ক্ষুদ্র এই প্রয়াস তাদের এই গানগুলো যদি বেঁচে থাকে। অমরশীল যৌবন কালে কিশোরগঞ্জের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীকে গান শিখিয়েছেন, এখন তারাই গুরুর খোঁজ রাখেন। দেখতে আসেন। এতটুকুই অমরশীল এর সান্ত্বনা। তাঁর নাতনী মাধবী রানী শীলই শুধু দাদার (পরিবারের মধ্যে) গানগুলো গান। দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে ছোট ছেলে সুজন চন্দ্র শীল কীর্তন গান করেন। মাধুবী রানীর সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, তিনি তাঁর দাদুর গান রেডিওতে গেয়েছেন। সুযোগ পেলে দাদুর গান টেলিভিশনেও গাইতে চান।

অর্চনা রানী শীল শ্বশুরের গানের খুব কদর বোঝেন। বার বার তাঁর শ্বশুরের বিভিন্ন গানের কথা বলেছেন ছোট একটা চটি বই বের করে দিলেন আমাদের সামনে। যিনি এই বইটি মুদ্রণ করে দিয়েছেন তিনি এক সংগীতানুরাগী। নাম তাঁর বিশ্বজিৎ রায়, যিনি 'নিবেদন' নামে একটি সৃজনশীল গানের দলের সম্মানিত পরিচালক। অমর চন্দ্রশীল কে খুঁজে বের করতে তাকে সার্বিক  সহযোগিতা করেছেন

কিশোরগঞ্জের আরেক গুণী সাধক জনাব আবুল হাশেম। বিশ্বজিৎ রায়ের উদ্যোগ না থাকলে এবং অমরশীলের খাঁটি শিষ্য আবুল হাসেমের সহযোগিতা না থাকলে হয়তো এমন একটি গানের বই ও প্রকাশ হতো না। লোক মুখে ফিরতে ফিরতে অমরশীলের এই গান গুলো হয়তো বিকৃত হতে হতে টিকে থাকতো কিছু আর কালে গর্ভে হারিয়ে যেতো বাকী সব অমর সৃষ্টি। অনেক দুর্বৃত্ত তার গানকে নিজের গান বলেও চালিয়ে নিয়েছেন।

মরমী এই শিল্পী এখন জীবন্ত কিংবদন্তী। ৬১ টি গান এই গানের সংকলনটিতে প্রকাশিত হয় । প্রেম, বিচ্ছেদ, প্রশস্তি, দেহতত্ত্ব, কৃষ্ণ বন্দনা, নবী বন্দনা কি নেই তাঁর গানে। সদা অসাম্প্রদায়িক এই গীতিকার সকল ধর্মের প্রতিই ছিলেন অসমম্ভব শ্রদ্ধাশীল। গীতিকার অমরশীল যশোদলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন, বীরদামপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় প্রখ্যাত সংগীত সাধক ও শিল্পী প্রাণেশ ভৌমিকের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম গ্রহণ করেন। এরপর প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের খ্যাতনামা সৈনিক অখিল ঠাকুরের শিষ্যত্ব লাভ করেন। তাঁর অনেক গানে তিনি অখিল ঠাকুরে নাম সংযোজন করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্প ছিলেন তিনি।

সখিরে আমার বন্ধুয়ার নাই খবর

আমার বন্ধুয়ার নাই খবর ।।

যার লাগিয়া পাগল হই আমি ।।

লোকে বলে আন্তর জামিরে
একদিন দেখা পাইতাম দেখি
জোড়াইতাম আমার অন্তর
আমার বন্ধুয়ার নাই খবর
যখনে ঘুমাইয়া থাকি

অন্তরে বন্ধুরে দেখি গো ।।

চমকে জাগিয়া দেখি

শুন্য দি আমর বাসর
আমার বন্ধুয়ার নাই খবর
কেন্দে বলে দিন মোরে
এমন বান্ধব নাই সংসারে গো
কোলতে বসাইয়া মোরে
করিতে প্রেমের আদর
আমার বন্ধুয়ার নাই খবর[৪৩]।

তাঁর নাতনীর মুখে আমরা এই গানটি শুনি।

তাঁর ছাত্র আবুল হাসেম এর সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন থেকে তাঁর জন্য কিছু ভাতার ব্যবস্থা হয়। অমরশীল একজন খাটি দেশ প্রেমিক ছিলেন, তিনি তার লেখা একটি দেশাত্ববোধক গানে বলেছেন-“বাংলা আমার মায়ের ভাষা, বাংলা আমার প্রাণ

জীবন দিয়ে রাখবো সদা বাংলা মায়ের মান।

নিজে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের বাড়িতে আপ্যায়ন করেছেন, সহযোগিতার জন্য যখন যে মুক্তিযোদ্দা সাহায্য চেয়েছে, তিনি তার সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। দেহতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব যাই বলি না কেন অমরশীলের বেশীর ভাগ গানেই এর প্রতিপালন আছে। যেমন তাঁর নিম্নোক্ত গানে তিনি বলেছেন-

নাম হতে নাম আরো সুমধুর
অন্তরে বাজেনা সে নামের সুর
সেই নাম সাধিতে হলো না ভাগ্যতে
হল শুধু বদনাম।।

৪৩.সুচরিতা রয় (সম্পা.); *অমর শীলের গান*; (ঢাকা: নিবেদন, ২০০৮) পৃষ্ঠা: ৩৮

একটি গানে তিনি বলেছেন:

দীন অমরের কথা রাখ নামের হলুদ গায়ে মাখ
গুরুর পদে নয়ন রাখ
অরুপে স্বরুপ দেখ না[৪৪]।

অমরশীল তার অন্য আরেকটি গানে বলেছেন:

পার কর আমারে দয়াল পার কর আমারে
অকূল নদীর ব্যাকুল পাড়ি ছেঁড়া বাদা হাওয়া নাইরে[৪৫]।।

এ ধরনের আরেকটি গানে তিনি বলেছেন:

সেদিন যেন আমার কর পার দয়াল বন্ধুরে
সে দিন যেন আমার কর পার।।
সেদিন পার ঘাটায় বসিয়া কাঁদব বেকারার[৪৬]।।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেম, বাবা লোকনাথ ব্রাহ্মচারী, রামনাথ, আল্লাহ-রাসুলের (সা:) কথা তাঁর গানের প্রতি কলিতেই যেন বিচরণ করে। এছাড়া তিনি বিচরণ করেছেন কবিগান, বাউল গান, হোলী গান, ঘাটু গান, গীর্তন লালন, জালাল গীতি, হাসন রাজার গান, শ্যামা সংগীতে। এসব গান নিজে গেয়েছেন ও শিখিয়েছেন ছাত্র ছাত্রীদেরকে। তাঁর একটি গানে:

এসোরে ভাই, একতারাতে গাই বউলের গান
যে গান শুনে জুড়ায় অঙ্গ দেহমন প্রাণ।।
পল্লীগীতি ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া মুর্শিদ
দেহতত্ত্ব মারফতি আর বিচ্ছেদী সংগীত
ভজন প্রেমের গানে গানে উদাস করেও প্রাণ ।।

যে গান আছে তোমার ধাতে আমার ধাতে ভাই
সে গান গেয়ে সবাই এসো পরান জুড়াই।।
প্রশ্ন কর উত্তর ধর মধ্যে মধ্যে গান
মিলন বিচ্ছেদ ভাইরে জুড়াও এ পরাণ।।
কাঙ্গাল অমর গানে গানে তারে পেতে চান।।

---

৪৪.সুচরিতা রয় (সম্পা.); *অমর শীলের গান*; (ঢাকা: নিবেদন, ২০০৮) পৃষ্ঠা: ১৩
৪৫.সুচরিতা রয় (সম্পা.); *অমর শীলের গান*; (ঢাকা: নিবেদন, ২০০৮) পৃষ্ঠা: ১৬
৪৬.সুচরিতা রয় (সম্পা.); *অমর শীলের গান*; (ঢাকা: নিবেদন, ২০০৮) পৃষ্ঠা: ১৮

অমরশীল আরেকটি বিখ্যাত গান তার নাতনী মাধবী রানী শীল গেয়ে শোনান-

আমার যারে ভালো লাগে গো
তারে কোথায় পাবো গো
মন কাঁন্দে যার লাগিয়া
আমার মনে লয় দুনিয়া খোরে দেখিতাম খুঁজিয়া গো
মন ও কাঁন্দে প্রাণ কাঁন্দে
আমার যারে লাগে ভালো আমি যার তার লাগিয়া
আমার মন দিলাম প্রাণে ও দিলাম যাচিয়া যাচিয়া গো
আমার যারে ভালো আমি যার তার লাগিয়া।
আমি একদিন ও দেখিলাম না তারে
দু'নয়ন ভরিয়া
আসতো বন্ধু দেখতাম তারে
তার নাম শুনে প্রাণ সপে দিলাম
না দেখলাম ভাবিয়া

আমার বন্ধুর থেকে

ধরলো রোগে

কোনদিন যাবই মরিয়া

আমার যারে ভালো  আমি যার তার লাগিয়া (২)

তাঁর ছোট ছেলে বাবার লেখা একটি গান গেয়ে শোনান:

আমার আর কী হবে সাধন ভজন

আমার মন তরে আর বলবো কত।।

খেলছো কত দাবা পাশা

তার মন করেছো খাসা

ঠিক না করে নিজের বাসা

পরের প্রেমের

আমর মন.....কত

ছেড়ে দাও এই ভবের আশা

এই দুনিয়া ঘুরতাম আসাম

প্রাণ পাখি একদিন ভাঙবে বাসা

ছেড়ে যাবে জন্মের মত

আমার মন.....কত।

গুরু কী ধন চিনলে না মন

বিফল তোমার মানব জন্ম

অমর বলে মনের বেদন

মন হলো না মনের মতন

আমার আর কী হবে সাধন ভজন

মন তবে আর .....কত।।

বাবার গান গেয়ে সুজন সব সময়ই আনন্দ পান যদিও তিনি মূলত কীর্তনই গেয়ে থাকেন। তিনি চান তাঁর বাবার গান আরো প্রচারিত হোক।

অমর শীলের আরেকটি গান এখানে তুলে ধরা হল:

আমার মনের আগুন দিয়াছি জালাইয়া সজনী গো
পারিনা মনেরে বোঝাইয়া
আমার মন মানে তো প্রাণ মানে না
পারিনা মনেরে বোঝাইয়া।।

আমার আখির কোনে বন্ধুর বাড়ী
তবু তারে ধরতে নারি
জনম গেলো তাহারে খুঁজিয়া
আমি তারে পাবো বলে।

আমি থাকতে না পাইলাম তারে
আসিয়া এ সংসারে
আমার গনার দিন গেলো রে ফুরাইয়া
আমি মরলে কি আর পাবো তারে
আমার মরণের দিন আসলো ঘনিয়া
আমার.....বোঝাইয়া

আমার পরাণ বন্ধু কয় না কথা
এ হইলো মোর মনের ব্যাথা
বনের ফুলে বনে যায় শুকাইয়া
আমার মনের আশা মনে রইলো
এই জনম বিফলে গেলো

আমার মন মানে তো প্রাণ মানে না[৪৭]।

কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলের অন্যতম এক বাউল শিল্পী জানে আলম নান্নু, গীতিকার আবুল হাসেম এর একটি গানের কথা বলেন-

রিকসা চালাইন (চালান) বইন (বোন) জামাইগো
বাড়ির ভিত্তে (ভেতরে) আউহাইন ফিড়িত (পিড়ি) বইয়া (বসে)
দুইডা (দুটি) ফিডা (পিঠা) খাও হাইন (খান)।

অতিথি পরায়ণ হাওরবাসী সব সময় আপ্যায়ন করেন খুব আন্তরিকতার সাথে। এই গানটি তারই উদাহরণ বহন করে। এখনকার দিনে অতিথি আপ্যায়ন অনেক সহজ, সব কিছু প্রায় তৈরি অবস্থায় দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। ঢাকার অলিতে গলিতে শীতের পিঠা পাওয়া যায়। বছর জুড়ে মেলাতেও বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যেবাহী পিঠা কিনতে পাওয়া। জেলা শহরেও এখন সন্ধ্যা বেলায় মোড়ের দোকানে পিঠা তৈরি, হয় বিক্রিও হয় ঢেড়। কিন্তু আগের সে আন্তরিকতা কই? অতিথি বাড়িতে এলে ডেকে বসিয়ে জল খাবার পরিবেশন, নিজের হাতে পিঠা বানিয়ে খাওয়ানো, এমন আন্তরিকতাপূর্ণ  পরিবেশ দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই গানগুলো একদিন হারিয়ে যাবে কালের আবর্তে। তাই এসব গান সংগ্রহ করা একান্ত জরুরি। এই শিল্পীর নিজের লেখাও সুর করা একটি গান গেয়ে শোনান তিনি-

আমরা পুরুষ বলে থাকি, নারী কোন কাজের নয়

নারী কিন্তু কাজে দুর্বল নয় গো, নারী কিন্তু কাজে দুর্বল নয়।

এই গানটির ব্যাখ্যা দেন তিনি এভাবে নারীদের কাজের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি আমরা পুরুষরা কখনো দিই না- 'আমি গীতিকার হিসাবে মনে করি ঘুম থেকে উঠা হতে শুরু করে রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করা পর্যন্ত সদা কর্ম ব্যস্ত থাকেন নারী তার মতে পুরুষগণ করে ৬ পদের কাজ আর নারী গণ তাদের থেকে ৮ গুণ বেশি কাজ করেন। অর্থাৎ ৪৮ পদের কাজ। নারীগণ শিক্ষিত হলে তারা পুরুষগণের থেকে বেশি নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেন। নারী প্রধানমন্ত্রী, নারী বিরোধী দলীয় নেত্রী। যার ছেলে সন্তান নেই, তাকে দু:খ করতে না বলেছেন তিনি। তিনি পিতাগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন- আপনারা মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিন, তাহলে দেখবেন পুরুষদের থেকে বেশি সাফল্য নিয়ে ঘরে ফিরবেন তারা।

---

৪৭.সুচরিতা রয় (সম্পা.); *অমর শীলের গান*, (ঢাকা: নিবেদন, ২০০৮) পৃষ্ঠা: ৩৬

কথা হয় কিশোরগঞ্জের অন্য আরেক স্বনামধন্য শিল্পী দ্বীন ইসলাম বাচ্চু বয়তীর সঙ্গে। তিনি একাধারে শিল্পী ও অভিনেতা। গম্ভীরা ধাচের গান করেন নাতীর চরিত্রে। অসাধারণ অনবদ্য তাঁর অভিনয়। তিনি একটি গান শোনান যার গীতিকার ও সুরকার খায়রুল আলম বাদল:

যার লাগিয়া পরান কান্দে
সে যে থাকে উজানে
সে যে আমর বুজান (বোন) এর ননদী।।

প্রাণো সখিগো-

বৈশাখ মাসে ধান উঠাইয়া
আষাঢ় মাসে দিবো বিয়া
তারে যদি দিবই (দিবে) বিয়া
কি লাভ আমার.....

নিটোল প্রেমের গান এটি। বোনের ননদ অর্থাৎ বেয়াইনকে ভালোবাসেন শিল্পী। গ্রামে বৈশাখ মাসে ধান ঘরে তোলার পর সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠান হয় আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। প্রাণ সখির যদি বিয়ে হয়েই যায তেব তার লাভ কী বেয়াইনকে ভালোবেসে।

বয়তী গম্ভীরা ধাচের যে গানটি পরিবেশন করেন- তার একজন সঙ্গী নানা চরিত্রে কণ্ঠ ও অভিনয় দানকারী আর সেই শিল্পীর নাম জানে আলম নান্নু। কি নেই সেই গম্ভীরাতে ইভ টিজিং, বাল্য বিবাহ, অশিক্ষার, কুফল। শিক্ষণীয় এই গম্ভীরাটি শ্রোতাকে সমাজ সচেতন করে তুলবে। এই গম্ভীরার রচয়িতা ও খায়রুল আলম বাদল। শিল্পী জানে আলম নান্নুর আরেকটি সমাজ সচেতনতা মূলক গান-

উত্যক্ত কইরোনা মেয়েদের তোমরা
প্রতিরোধ গড়তে নেমেছি আমরা ।।
আমাদের কন্যা আমাদেরই বোন
তোমাদেরই বন্ধু ভেঙ্গোনা তার মন
পথে ঘাটে রাস্তায় কর ভালো আচরণ
সম্মান করে হও নিজেই মহান।

শিল্পী এখানে বলতে চেয়েছেন নারীকে সম্মান করলে সে সম্মানে নিজেই সম্মানিত হওয়া যায়। মেয়েরাতো পণ্য নয়, চিড়িয়াখানাও নয়। আমাদের এই সমাজ সবার, স্বাধীনভাবে চলার অধিকার ও সবার । নারী কারো বোন কারো মা কারো কন্যা। তাদের অধিকার পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই তাদেরকে সম্মান করলে সে সম্মান নিজেই পাবো। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে তার আরেকটি গান-

চল চল চল আমরা তরুণ দল
বন্ধ করতে  বাল্য বিয়ে, আমরা একদল।
অল্প বয়সে বিয়ে করে চাইনা মরিতে,
বয়স ছাড়া বসবো না বিয়ের পিড়িতে
নিজের জীবন নিজে গড়ে করিব উজ্জল ।
বন্ধ করতে বাল্য বিয়ে আমরা একলদ।

অমরশীল এর অন্যতম আরেকটি গান গেয়ে শোনান ভাটি অঞ্চলের এক খাঁটি জাত শিল্পী তাকে খাঁটি শিল্পী বলা একারণে যে নিতান্ত গরীব ঘরে  জন্ম নেয়া গান পাগল এই শিল্পীর গলা শুনে যে কেউ মুগ্ধ হযে যাবে। তবলা বাজাতে পারেন, হারমোনিয়ামা বাজিয়ে গান গাতে পারেন। মন্ত্র মুগ্ধের মতো গান গেয়ে ধরে রাখতে পারবেন হাজারো শ্রোতাকে একেই হয়তো বলা হয় God gifted গলা, এর জন্য চর্চা লাগে না। অবশ্য শিল্পী মান্না দে বলেছিলেন-সংগীত তুমি কার, যিনি চর্চা করেন তার। কিশোরগঞ্জের একটি পার্কে (নেহাল গ্রীন পার্ক) মালীর কাজ করেন। আগে নৈশ্য প্রহরীর কাজ করতেন, মালিক পক্ষের একজন উমর ফারুক, তাকে রাত বিরেতে গান গাইতে শুনে মুগ্ধ হয়ে মালীর চাকরী দেন। এতে খুশি হন সেই দরদী গায়ক, যার নাম হীমাংশু

ভৌমিক, মিটামইন থানার গোপদীঘি গ্রামে তার বাড়ি। নিত্য দিন তার শুরু হয় বাগানে গাছ ও ফুলের পরিচর্যা করে। চার কন্যার সকলকে বিয়ে দিয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে সুখেই দিনাতিপাত করছেন। গীতিকার ও সুরকার অমর শীলের  যে গানটি তিনি আমাদের সামনে পরিবেশন করেন সেটি হল:

আমার মরমীয়া বন্ধুরে, আমার দরদীয়া বন্ধুরে
আরে আর কত কান্দাইবি দয়াল আমারে।। (অমর শীলের বইয়ের-২৬)

ভাটির অন্যতম আরেক সাধক শিল্পী আলী হোসেন এর একটি গান শুনি-

আমারে নি নিবা গো নাইওর
যাইতাম বাপের বাড়ী।।
যে হতে দিলো নাইওর, না নিলো খবর।

তার এই গানের সাথে শচীনদেব বর্মণ এর-

কে যাস রে ভাটির গান গাইয়া
আমার ভাই ধনরে কইও নাইওর নিতো বইলা
তোরা কে যাস কে যাস

এই গানটির যোগসূত্র রয়েছে। উকিল মুন্সীর -

আষাঢ় মাইসা ভাসা পানি রে
পূবালী বাতাসে
বাদাম দেইখা চাইয়া থাকি
আমার নি কেউ আসে রে
আষাঢ় মাইসা ভাসা পানি রে।।

এই গানটির সাথে ও মিল রয়েছে উপরের দুটি গানেরই। এই গানটি শুনেছিলাম নেত্রকোনার শিল্পী শফিউল আলম স্বপনের মুখে উকিল মুন্সী সম্পর্কে তিনি আমাকে অনেক তথ্য দেন, যা আমার সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছে। শফিউল আলম স্বপন নেত্রকোনা জেলার সুসঙ্গ দূর্গাপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক। শখের বশে গান করেন। তার কাছে 'সাধের লাউ' গানটি সম্পর্কে নতুন একটি তথ্য পেলাম। যদিও গানটি সংগৃহিত। তারপর ও স্থানীয় শিল্পী নবী হোসেনের মতে এই গানের নাকি আরো একটি সঞ্চারী আছে-যা হল:

লাউ কাটিয়া কোন বা করলাম সার

ও তার দুই ধারে দুই বাঁশের বাঁশী

মধ্যে চিতলার তার

ভাটি অঞ্চলের পরতে পরতে এসব গান এখনো গাওয়া হয় কিন্তু এর উপর গবেষণা করেছে এমন গবেষকের সংখ্যা হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন। সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে এই আবেগী গান গুলো। আরেক গুণি সাধক কিশোগঞ্জের সুর সম্রাট আবু তাহের। তাঁর একটি গান এ রকম-

হায়রে সখি তোরা বলগো মোরে

কার সুখ দেখে প্রাণ জুড়াই

মনের মানুষ এই দেশেতে নাই রে

মনের মানুষ এই দেশেতে নাই।

কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয় প্রতি বছর ১লা ভাদ্র। নৌকা বাইচের উৎপত্তি কবে হয়, কিভাবে হয় এ নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন কিংবদন্তী। সোয়াই জনী নদীর তীরে তখন

ছিলো শ্রী চৈতন্য দেবের আখড়া। সেই আখড়ার ঘাটে এক পরমা সুন্দরী কেউ বা বলেন মনাস দেবী, পানি আনতে গেলে দুই মাঝি যুবক তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে একই সাথে প্রেম নিবেদন করলে সুন্দরী বলেন লাল গোসাইয়ের আখড়া ঘাট থেকে নৌকাবাইচ করে তার ঘাটে আসতে হবে, যিনি প্রথম হবেন তাকেই সুন্দরী মন দেবেন।

দু'জনের প্রেম এতই গভীর ছিলো যে দুজনই সমান সময়ে নৌকা নিয়ে চৈতন্য দেবের ঘাটে এসে পৌঁছান, সুন্দরীর সাথে তাই কারো প্রেম হল না একই সাথে কি দু'জনকে মন দেয়া যায়। তাই সুন্দরী দেবী বললেন প্রতি বছর এই দিনে যেন সোয়াই জনী নদীতে নৌকা বাইচ হয় তাতে করে দুই জেলের প্রেম অমর হয়ে থাকবে। সেই থেকে নৌকা বাইচ শুরু ভাটির সাধক পুরুষ খায়রুল আলম বাদলের কাছ থেকে আমি নৌকা বাইচের ধারাবাহিক গান গুলো সংগ্রহ করি। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর দল নিয়েও এই ধারাবাহিক গান গুলো পরিবেশন করে থাকেন।

**<u>চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬):</u>** নেত্রকোনা জেলার আধ্যাত্মিক, মরমী কবি, সুফি, বাউল এর মতো বাংলাদেশের আর কোন জেলায় এতো জন্মায়নি। গবেষণা ও সংগ্রহের অভাবে এসব মরমী কবির গান হারিয়ে যাচ্ছে কালের স্রোতে। এসব কবিগণের জীবনী ও তাদের কীর্তি সংগ্রহ না করলে ভবিষ্যতে অমর এই গানগুলোর ঐতিহ্য বিলীন হয়ে যাবে। গারো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ধনু , ঘোড়াউতরা, কংস, মগড়া, সোমেশ্বরী নদীর বয়ে চলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে গান পাগল নেত্রকোনা বাসীর কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করতে বিশাল



চন্দ্রকুমার দে

তিনি তেল, নুনের হিসাবের খাতায় কবিতা লিখে রাখতেন বলে তার চাকরিটাও যায়[৪৮]। এরপর তিনি জমিদারের গোমস্তার কাজ পান[৪৯]। তাঁর এই চাকরী সাহিত্য চর্চার জন্য আরো উপযোগী হয়ে উঠে। এর আগে একটি অধ্যায়ে চন্দ্রকুমার দে এর কথা উল্লেখ করেছি আমি।

৪৮.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩) পৃষ্ঠা: ৫০

৪৯.মল চৌধুরী (সম্পা.); *ময়মনসিংহের ইতিহাস, সংগ্রহ ও গ্রন্থনা,* (কলকাতা: দে'জ, ২০০৫) পৃষ্ঠা: ভূমিকা অংশে দ্রষ্টব্য

তাঁর অনেক কবিতা গান আকারে গাওয়া হতো। সংগ্রহ ও চর্চার অভাবে ভাটি অঞ্চলের গানের ভাণ্ডারে তাঁর গানগুলোর স্থান হয়নি। তাই এসবের ওপর ব্যাপক ভাবে গবেষণা হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি।

মোহম্মদ জালাল উদ্দিন খাঁ

মোহম্মদ জালাল উদ্দিন খাঁ[৫০]:

নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার সিংহেরগাঁও নিবাসী বাউল কবি মোহম্মদ জালাল উদ্দীন খাঁ। মদনপুর গ্রামের নিকটস্থ তেঁতুলিয়া গ্রামের পাশে মনাং গ্রামের এক ব্রাহ্মণ, যার নাম শচীন শর্মা। একবার এক মারাত্মক অসুস্থতায় পর্যবসিত হয়ে বুড়াপীর নামে খ্যাত সৈয়দ খোয়াজ নামীয় এক ধর্ম প্রচারকের শরণাপন্ন হন এবং আরোগ্য লাভের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। গ্রাম্য পাঠ্যশালায় পড়াশোনা শুরু করেন তিনি এরপর নেত্রকোনা ও কেন্দুয়া হাইস্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর এক নিকট আত্মীয়ার সাথে তাঁর বিবাহ হয । তখন চলছিল স্বদেশী আন্দোলন, নানা বিপর্যস্ততায় তাঁর পড়াশোন বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা ১৩৩০ সালে এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে তার স্ত্রী বিগত হন। স্ত্রী বিরহে তিনি সংসার ত্যাগী হন এবং তার সংগীত সাধনার এখানেই

শুরু। সুফি মতবাদে আকৃষ্ট ছিলেন তিনি। ধর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদার ।

“বিশ্ব রহস্য” গ্রন্থটি তার অন্যতম সৃষ্টি। তাছাড়া জালাল গীতিকা ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে এ পর্যন্ত তার লেখা প্রায় এক হাজার গান প্রকাশিত হয়। আটটি খণ্ড নিয়ে একত্রে প্রকাশিত তাঁর ‘বিশ্ব রহস্য’ গ্রন্থটি এক অনবদ্য রচনা। বিশ্বরহস্য, জীবাত্মা, পরমাত্মা, জন্ম-মৃত্যু, জীবনের রুপ, মানবের অভ্যুদয়, দেবতা রহস্য, প্রতিমা পূজা, অবতার, বৌদ্ধধর্ম, হিংসা, পয়গম্বর, নবীজি (সা:) এর পূর্ব পুরুষ ও তাঁর জীবনী,

---

৫০.জালাল উদ্দিন খাঁ (সম্পা.); *জালাল গীতকা*; (কিশোরগঞ্জ: কিশোর প্রকাশনী) পৃষ্ঠা: ভূমিকা অংশে দ্রষ্টব্য

খিলাফত, ইমাম মাহাদী, বাংলায় ইসলাম প্রচার বিষয় নিয়ে তার রচনা বিজ্ঞ পাঠককে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি মনে করি। ১৯৭২ সালের ১লা আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন[৫১]। সিংহের গাঁও গ্রামে তার মাজার শরীফ অবস্থিত। তার গানের কিছু কলি এখানে তুলে ধরা হল:

আমি তুমি এক হইলাম না যৎসামান্য ব্যবধানে
খুলে মুলে একই বটে বুঝিলাম তাই অনুমানে।।

তাঁর এই গান টিকে তিনি নাম করেছেন (আত্ম-তত্ত্ব) নামে। এই আত্ম তত্ত্বের তৃতীয় কলামে আবার বলেছেন।

কই তুমি আছ খোদা তোমার লাগি রই পেরেশান
তুমি  আমি এক হইলাম না রইল সামান্য ব্যবধান
আপন ভেবে আছো তুমি আমার এই না ঘরেতে

যখন যেথা চলি আমি তুমি থাক মোর সাথে।

আধ্যাত্মিক ধাচের এই গানটির মর্মার্থে বোঝা যায়-জালাল উদ্দিন সত্য ও ন্যায়ের পথে এবং ধর্মের পথে থেকে শুদ্ধ হয়ে আল্লাহর সহচর্য চেয়েছেন। পরিশুদ্ধ মানুষ মাত্রই পবিত্র। এমন আমরা কজন হতে পারি। তাই তিনি বলেছেন-

তুমি আমি এক হইলাম না যৎসামান্য ব্যবধানে

আমরা আল আসউল হুসনার ৯৯টি নাম বলতেই আল্লাহর প্রিয় নাম সমূহেকে বুঝি। আর গীতিকার এখানে বোঝাতে চেয়েছেন সৃষ্টিকর্তার প্রিয় নামে একেক জন অভিহিত হলেও কজন তাঁর নির্দেশিত পথে চলি, কজন তাঁর নির্দেশিত আদর্শের পথ বেছে নিই। নাম আর চরিত্র কে এক সাথে মেশাতে গেলে তখন আর কাউকেই সেই নামের মাঝে খুঁজে পাইনা। জালাল গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে পরম তত্ত্ব নামে অধ্যায়টি তিনি কোটি রুপের পরমাত্মার কথা বলেছেন এভাবে-

পরব্রহ্মা পরমাত্মা নিরাকার মন কয় যাহারে
কতকোটি রুপে আকার লইয়া বাস করে যায ভব পুরে

এখানে ৩৩ কোটি দেবতার কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। পরমাত্মা মূলত নিরাকার কিন্তু তার কতকোটি রুপ। এই পরমাত্মার সন্ধানে আমরা কোথায়না ছুটে বেড়াই, এই মর্মার্থ উপলব্ধি করে তিনি বলেছেন-

৫১.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা;* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩) পৃষ্ঠা: ৬৮

তন্নতন্ন করে খুঁজিয়া তোমারে
আসিয়াছি ফিরে নিরাঙ্গ হইয়া।।
তাদের বাহিরে শহর বাজারে
মাঠে মাঠে ঘুরে কত তালাসিয়া
নদ-নদী মোহনায় পাহাড়ী ঝরণায়
সাগর তলায় কত দেখলাম ডুবিয়া।।

যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বা যে সময়ে তিনি এই গান গুলো রচনা করেছেন, সে প্রেক্ষিতে এই গানগুলো চির অম্লান হয়ে থাকবে। চর্চা ও সংরক্ষণের অভাবে এই গানগুলো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। তার গানের সাথে সুফিবাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তৎকালীন সময়ে এরকম উদার মানসিকতার কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাঁর এই গানগুলো সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরি এবং এই ভাটি অঞ্চলের মনীষীগণের উপর অনেক গবেষণা হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে আমার সাথে একমত হন নেত্রকোনার সুসঙ্গঁ দূর্গাপুরের আরেক সাংস্কৃতিক তথ্য সংগ্রাহক এ্যাডভোকেট সজয় চক্রবর্তী। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত উদ্যেগ এ বিষয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করবে।

<u>কুদ্দুস বয়াতী[৫২]:</u> অধুনা বিখ্যাত বাউল শিল্পী কুদ্দুস বয়াতী। এক সময় পালা গান গাইতেন, এখন পালাগান রচনাও করেন। পল্লি সংগীত শিল্পী ও পল্লিগানের গীতিকার নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার দিঘলকুশা রজিবপুর গ্রামে তাঁর বাস। পিতা: মোহাম্মদ আরফান আলী বেপারী। ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ১৮ বছর বয়স থেকে তিনি পালাগান গাওয়া শুরু করেন। বাবা ছিলেন

কুদ্দুস বয়াতী

---

৫২.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; (ঢাকা: বাংলা একাডেমি ২০১৩) পৃষ্ঠা: ৫০

কেন্দুয়া অঞ্চলের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে নৌকা নিয়ে পালাগান গেয়ে গেয়ে দিনাতিপাত করতেন  সঙ্গী আরো দু তিন জন ছেলে। চারপাশে তখন তার নাম ছড়াতে থাকে। ওস্তাদ তার মনসুর বয়াতী। তার কাছ থেকে তিনি অনেক পালা গান শিখেছিলেন। ৮১টি পালাগান তাঁর মুখস্ত ছিলো। এর মধ্যে নিজে রচনা করেছেন ২১টি পালা গান। তাঁর পালা গানের দলের নাম “কুদ্দুস বয়াতী ও তার দল” ।

দলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয় ৬/৭ জন। আয় রোজগার যখন বেড়ে যায় তখন পুরো সংসারের দায়িত্ব তাকেই নিতে হয়। পালা গান গাইতে

গিয়ে পরিচয় হয় তাড়াইল উপজেলার ঘচিয়া গ্রামের সনাতন ধর্মের মেয়ে রিতা রানীর সাথে। তারপর প্রেম ও বিয়ে। সন্তান সংখ্যা ৪জন। দুই ছেলে ও দুই মেয়ে । কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মিডিয়াতে স্থান করে দেন। এখন কুদ্দুস বয়াতী একটি অতি পরিচিত নাম। পল্লীগীতি, আঞ্চলিক গান ও মেয়েলী গান সহ ভাটি অঞ্চলের আরো নানান গানে তাঁর পারঙ্গমতা এখন সর্বজন বিধিত। এখন তার কিছু গান তুলে ধরবো-

নাও নষ্ট গুদারা ঘাটে পুরুষ নষ্ট হাট বাজারে

আমি নষ্ট হইলাম রে দাসী সানে বান্দাইল ঘাটে।

আকালে ছাগল বাদী জালে বন্দী মাছ

নারীর হাতে পুরুষ বন্দী ঘুরে বার মাস

কোদালে কাটিয়া মাটি লাগায় সাধের লাউ

যৌবন কালে পীরিত করতে মনে উঠে বাউ (ভাব)।

কোদালে কাটিয়া মাটি লাগায় সাধের উরিঙ্গিম

যৌবন কালে পুরুষ মানুষ ঘুরে বাড়ি বাড়ি।

কুদ্দুস বয়াতীর পালা গানের মধ্যে বিখ্যাত হল[৫৩]:

হলেক বাদশা, রতন বাদশা, রহিম বাদশা, ইন্নছ বাদশা, কারণ বাদশা ইত্যাদি।

৫৩.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩) পৃষ্ঠা: ৬৮

উকিল মুন্সী

<u>উকিল মুন্সী:</u> ভাটি অঞ্চলের মানুষের দু:খ-কষ্ট, প্রেম-বিরহ, আধ্যাত্মিকতা-দেহতত্ত্ব, সবই প্রতীয়মান হয়েছে উকিল মুন্সীর গানে। নেত্রকোনার খালিয়া জুরি উপজেলার নূরপুর গ্রামের বোয়ালীতে এই বিরহী উকিল মুন্সীর জন্ম। তাঁর মৃত্যু ১৯৭৮ সালে। একই সুতায় তিনি বেধেছেন ইসলামের শরিয়ত ও মারফতের ব্যাখ্যা । এই মেল বন্ধন তার প্রতিটি গানেই গাওয়া তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গান হল:

পূবালী বাতাসে আষাঢ় মাইসা ভাসা পানিরে।

বাদাম দেইখা চায়া থাকি আমার নি কেউ আসে রে।।

উকিল মুন্সির আরেকটি অন্যতম ভাটিয়ালি গান

ভাইটাল তরী কে যাও বাইয়া রে

ও মাঝি ঘাটে নাও ভিড়াও

মুই অভাগী চিরদুঃখী খবর লইয়া যাও রে।।

দূর দেশে দিছেন গো বিয়া থাকি পরবাস

আমার বাপের দেখা পাইলে করিও জিজ্ঞাস,

কইও কইও মাঝি ভাই নইলে মাথা খাও

কুল-জাতি যাইব না পাঠাইলে নাও রে।।

দুঃখ দিতে জানে বন্ধে দুঃখ বোঝে না

কান্দাইতে জানে বন্ধে কানতে জানে না,

মায়ে যে গো দিছে বিয়া না বুঝে সম্মান

দেশ-বিদেশ মুই অভাগীর কলঙ্কিনী নাম রে।।

চিনাইয়া দেই বাপের বাড়ি দূর দেশান্তর

বাপের বাড়ি যাইতে আছে এক মায়ার সাগর,

সেই সাগরের সেই পাড়ে সাদা রঙের ঘর

উকিল কয় সেই ঘরেতে জানাইও খবর রে।।

(২) পুবালী বাতাসে, আষাঢ় মাইসা ভাসা পানিরে

বাদাম দেইখা  চায়া থাকি আমার কেউ নি কেউ আসে রে।।

যেদিন হইতে নয়া পানি  আইলো বাড়ির ঘাটে

অভাগিনীর মনে কত শত কথা উঠে রে।।

গাঙ্গে দিয়া যায়রে কত নায় নাইওরির নৌকা

মায়ে ঝিয়ে বোইনে বোইনে হইতেছে যে দেখা রে।।

আমারে নি নিল না নাইওর পানি থাকতে তাজা

আমি দীনের  কথা বলে যাইতাম রাস্তা হইতো সোজা রে।।

কত লোকে যায়রে নাইওর এই না আষাঢ় মাসে

উকিল মুনশির হবে নাইওর কার্তিক মাসের শেষে রে।।

(৩) আমার গায়ে যত দুঃখ সয়

বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়।।

নিঠুর বন্ধুরে বলেছিলে আমার হবে

মন দিয়াছি এই ভেবে

সাক্ষী কেউ ছিলো না সে সময় ও বন্ধু রে

সাক্ষী শুধু চন্দ্রতারা একদিন তুমি পড়বে ধরা রে বন্ধু

ত্রিভুবনের বিচার যেদিন হয়।।

নিঠুর বন্ধু রে দুঃখ দিয়া হিয়ার ভিতর

একদিনও না লইলে খবর

এই কি তোমার প্রেমের পরিচয় ও বন্ধু রে

মিছামিছি আশা দিয়া কেন বা প্রেম শিখাইয়া রে বন্ধু

দূরে থাকা উচিত কি আর হয়।।

নিঠুর বন্ধুরে বিচ্ছেদের বাজারে গিয়া

তোমার প্রেম বিকি দিয়া

করবো না প্রেম আর যদি কেউ কয় ও বন্ধু রে

উকিলের হয়েছে জ্বালা কেবলই চোরের কারখানা

চোরে চোরে দেওয়া আলা হয়।।

রশিদ উদ্দিনের কিছু গান নিম্নে দেয়া হলো[৫৪]-

(১) মানুষ ধর, মানুষ ভজ, শুন বলি রে পাগল মন

মানুষের ভিতরে মানুষ করিতেছে বিরাজন।।

মানুষ কি আর এমনি বটে, যার কারণে জগত রটে

ঐ যে পঞ্চভূতের ঘাটে, খেলিতেছে নিরাঞ্জন।

---

৫৪.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; (নেত্রকোণা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩) পৃষ্ঠা: ৬৪

চৌদ্দতলার উপরে দালান তার ভিতর ফুলের বাগান

লাইলী আর মজনু দেওয়ান, বজ্রককে করছে শাসন।।

তালাশে খালাস মিলে, তালাশ কর রংমহলে

উঠিয়া হাবলংগের পুলে চেয়ে থাকে সর্বক্ষণ।

উঠিয়া দেখিবে পুলে দুই দিকেতে অগ্নি জ্বলে

ভেবে রশিদ উদ্দিন বলে, চমকিছে স্বর্ণের মতন।।

দুই ধারে দুই কারা, হায়াত মউত মাইঝখানে ভরা

সময় থাকতে খুঁজগে তোরা নিকটেতে কাল সমন।

সোনারপুরী আঁধার করে, যেদিন পাখি যাবে উড়ে

শূন্য খাঁচা থাকবে পড়ে, কে করবে আর তার যতন।।

(২) আমার শুয়া চাঁন পাখিক

আমি ডাকিতেছি তুমি ঘুমাইছ নাকি।

তুমি আমি জনম ভরা ছিলাম মাখামাখি

আজি কেন হইলে নীরব, মেলো দুটি আঁখি।

বুলবুলি আর তোতা-ময়না, কত নামে ডাকি

শিকল কেটে চলে গেলে কারে লইয়া থাকি

তোমার আমার এই পিরিতি, চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী

এই সাইথে কেন ভেঙ্গে দিলে, বুঝলাম না চালাকি।

বিশ্বজোড়া এই পিরিতি সবই দেখছি ফাঁকি

বাউল রশিদ বলে, ডাকলেই বা আর হবে কী।

সংগীত ঐতিহ্যে ভাটির জেলাগুলোর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্যতম। উপমহাদেশের ভাটিয়ালি সংগীতের সবগুলো শাখাতেই ব্রাহ্মণাড়িয়া অঞ্চলের সুর সম্রাটগণের আধিপত্য আছে। নিম্নে গুণী এই সাধক শিল্পীগণের মধ্যে কয়েক জনের পরিচয় তুলে ধরলাম:

<u>সরদার হোসেন খাঁ[৫৫]:</u> সরদার হোসেন খাঁর অপর নাম সদু খাঁ। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না । তবে তাঁর জন্ম নবীনগর থানার শিবপুর গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সংগীত প্রাণ। তাঁর এই সংগীত সাধনা বংশ পরম্পরায় টিকে আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর অনেক শিষ্য ছিলো, যারা তাঁর কাছে গান শিখেছেন, ওস্তাদ হিসাবে তাঁকে রেখেছেন শ্রদ্ধার আসনে। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন আর বেঁচে নেই।

<u>ফকির আবতাব উদ্দিন খাঁ:</u> সরদার হোসেন খাঁর পুত্র ফকির আবতাব উদ্দিন খাঁ। জন্ম শিবপুর গ্রামে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন ভাবে না থাকলে ও পিতার মতো সংগীত প্রেমী ছিলেন তিনি। প্রথম তালিম নেন পিতার কাছ থেকেই । তবলা বেহালা ও

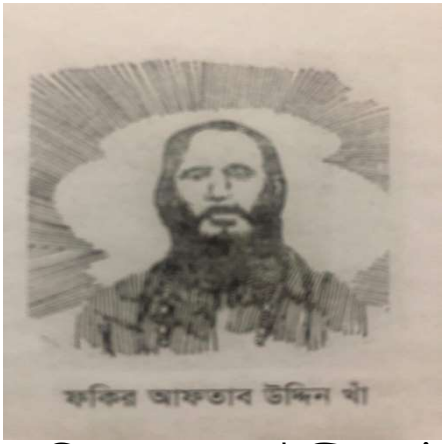

ফকির আবতাব উদ্দিন খাঁ

<u>আলাউদ্দিন খাঁ</u>: তাকে সুর সম্রাট বলা হয়। জন্ম ১৮৬২ সালে নবীনগরের শিবপুর গ্রামে। পিতা- সরদার হোসেন খাঁ। সংগীতের নেশা পিতার কাছ থেকে পাওয়া। তালিম গ্রহণ করেন বড় ভাই সাধক ফকির আফতাব উদ্দিন খাঁর কাছ থেকে[৫৭]। সংগীতের তৃষ্ণা মেটাতে তিনি বেরিয়ে পড়েন বিশ্ব

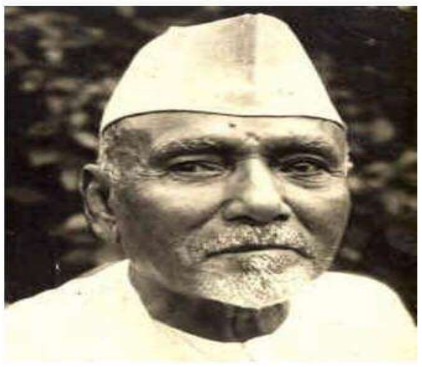

আলাউদ্দিন খাঁ

---

৫৫.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ৫০

৫৬.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ৭২

৫৭.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ৭২

১৯৫২ সালে সংগীত একাডেমি, ৫৮ সালে পদ্মভূষণ, ৭১ সালে পদ্মবিভূষণ পুরস্কার লাভ করেন। অধ্যাপক হিসাবে শান্তি নিকেতনে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। ‘খাঁ হেমন্ত’ ‘দূর্গেশ্বরী’ ‘মেঘ বাহর’ নামক রাগ রাগিনীর উদ্ভাবক ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর গান তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে সমৃদ্ধ করেছিলো।

<u>ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ:</u> জন্ম ১৮৮৪ সালে শিবপুর গ্রামে। পিতা সদু খাঁ। তালিম গ্রহণ করেন বড় ভাই আবতার উদ্দিন খার কাছে। গান গাইতেন ও সুর সাধতেন সেতার ও সুরবাহর বাজিয়ে। ওস্তাদ ওয়াজির খার কাছে ১৩ বছর ব্যাপী সংগীত শিখেন। কর্মজীবনে

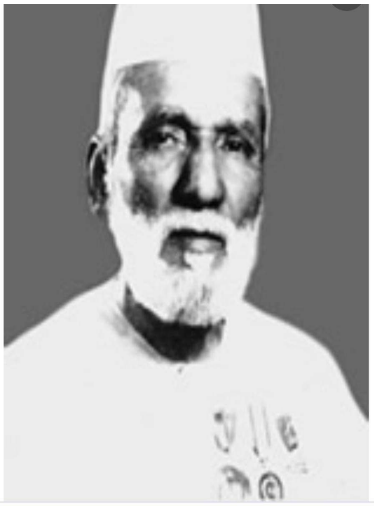

ওস্তাদ আয়েত আলী

রামপুর রাজ্যে সংগীতজ্ঞ হিসেবে আর ১৯৫৩ সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য 'গভর্নর পদক' পান ১৯৬০ সালে[৫৮]। ৬১ সালে তাঘমা-ই-ইমতিয়াজ ৬৬ সালে 'প্রাইড-অফ-পারফরমেন্স' সম্মানে ভূষিত হন। 'মনোহরা' ও 'মন্ত্রণাদন' নামে যন্ত্রের উদ্ভাবক তিনি। 'ধারিষ হেমন্তিকা', 'আওল চন্দ্রসারঙ্গঁ,' 'বসন্ত' ইত্যাদি রাগ রাগিনীর উদ্ভাবক । তাঁর চার পুত্রই সংগীতাঙ্গনে স্বনাম ধন্য। শেখ সাদী খাণ তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৬৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর গান ও সংগীত সাধনা তৎকালীন সমাজের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে প্রফুল্ল রাখতো । এই মহান মনীষী গণের গানের সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য ও প্রচুর গবেষণা হওয়া উচিত।

<u>ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ:</u> পিতা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। ১৪ বছর বয়সে তিনি এলাহাবাদের এক সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেন। বেহালা বাদক মেনুহীন এর আমন্ত্রণে নিউইয়র্কের আর্ট মিউজিয়াম হলে সংগীত পরিবেশন করেন। ম্যাকগিল ও মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা করেন।

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ

৫৮.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ৭৫

পণ্ডিত রবি শংকরের সাথে সেতার ও সরোদ পরিবেশন করেন[৫৯]। ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও 'পদ্মভূষণ' খেতাব প্রাপ্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সন্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করেন। আশিষ খাঁ ও ধ্যানেশ খাঁ তার দুই পুত্র ও সংগীত জগতের তারকা ছিলেন।

<u>ওস্তাদ ফুলঝুরি খান</u>: ফকির আফতাব উদ্দিন খার বংশধর ওস্তাদ ফুলঝুরি খাঁ। জন্ম ১৯২০ সালে নবীনগর বিটঘর গ্রামে । পিতা লতিফ রসুল খান। মূল নাম ইয়ার রসুল খান। প্রথম তালিম গ্রহণ করেন ফকির আফতার উদ্দিন খার কাছে যন্ত্র সংগীতে । সংগীতে তালিম নেন ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ ও ওস্তাদ আলাউদ্দিন

ওস্তাদ ফুলঝুরি খান

<u>মনমোহন দত্ত:</u> মনমোহন দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন বাংলা ১২৮৪ অব্দে। ছোট বেলা থেকেই তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। পিতা পদ্মনাথ দত্ত ও ছিলো সংগীত জগতের তারকা। বৈষ্ণব ও বাউল ধরনের সংগীতকে পৌঁছে দেন সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায়। মলয়া গানের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন তিনি। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে মৃত্যু বরণ করেন এই সাধক।

ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খাঁ: পিতা ওস্তাদ আলী আহমদ খাঁ। আজীবন সংগীত প্রেমী ছিলেন ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খা। তালিম গ্রহণ করে পিতার কাছেই। "দেশমনি" খেতাব প্রাপ্ত ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে কণ্ঠ সংগীতের তালিম গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী ছিলেন। ঢাকা সংগীত কলেজের অধ্যাপক হিসাবেও কর্মরত ছিলেন। সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, হংকং, রেঙ্গুন ও আফগানিস্তান সফর করেছেন। ১৯২৩ সালে ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন।

রওশন আরা বেগম (অন্নপূর্ণ): পিতা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। পিতার কাছে তালিম গ্রহণ করেন শৈশবেই। সুরবাহারে অসম্ভব দক্ষ ছিলেন তিনি। তাঁর বাদনে পিতাসহ সকল শ্রোতা মুগ্ধ হতেন। তার অপর নাম অন্নপূর্ণা।

৫৯.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ৭৬

শেখ সাদী খান

শেখ সাদী খান: খাঁ পরিবারের অন্যতম সুরকার ও গীতিকার শেখ সাদী খান। পারিবারিক পরিবেশে থেকেই সংগীতের প্রতি নেশা। পিতা আয়েত আলী খাঁর কাছে প্রথম তালিম গ্রহণ করেন। বাংলা চলচ্চিত্রে শেখ উজ্জ্বল নক্ষত্র

তাঁর সুর করা বিখ্যাত গানের মধ্যে অন্যতম হলো:

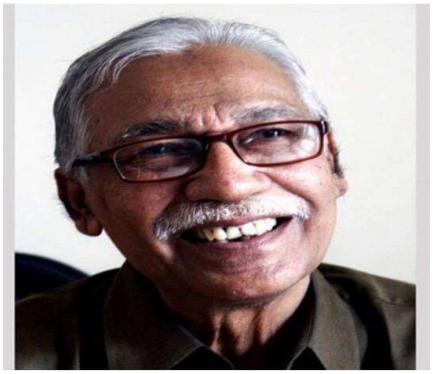

(১) আমার এ দু'টি চোখ পাথর তো নয়,

(২) ছোট্ট বেলায় মা আমাকে,

(৩) তুমি রোজ বিকেলে আমার বাগানে ফুল নিতে আসতে,

(৪) ডাকে পাখি খোল আখিঁ,

(৫) ভালো বাসলেই সবার সাথে ঘর করা যায় না।

এছাড়া ভাটি অঞ্চল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংগীত জগতে অসামান্য অবদান যারা রেখে গেছেন এবং এখনো যারা দ্যুতি ছড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁ, দুলামিয়া (লোকশিল্পী) অমর পাল, ওস্তাদ আবেদ হোসেন খাঁ, ওস্তাদ মীর কাশেম খান, ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান, আফজালুর রহমান, ওস্তাদ খুরশিদ খান, সৈয়দ আব্দুল হাদী, ওস্তাদ আলী আহমদ খান, ইরশাদ আলী খান, ইসরাইল খাঁ, ফজলুল করিম, ভুবন রায়, গজেন্দ্রলাল

রায়, উমেশচন্দ্র রায়, প্রীতি চক্রবর্তী, স্মৃতি চক্রবর্তী, আশীষ খান, ধ্যানেশ আহমেদ প্রমুখ। তাছাড়া পুঁথি পাঠের শিল্পীগণের মধ্যে অন্যতম হলেন- দীন মোহাম্মদ, মো: খলিল উর রহমান, আবেদ আলী, মো: মহরম আলী, রেহান উদ্দিন প্রমুখ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের মেয়েলী সংগীতগুলো যারা করতেন এবং এখনো যারা করে চলেছেন তাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল: আউশি বিবি, মিরাশি বেগম, জ্যোৎস্না বেগম, রাজিয়া খাতুন, আফিলের মা, আম্বিয়া বেগম, মনোয়ারা বেগম, ফুলমতি বেগম, জায়েদা বেগম, রোখশানা বেগম প্রমুখ। ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার মেয়েলী সাংগীত গুলো প্রথম সংগ্রহের উদ্যোগ নেন এবং সফল হন কবি আসাদ চৌধুরী। বিবাহ, মৃত্যু ও জন্মে এসব মেয়েলী সংগীত হিন্দু-মুসলমান উভয় পরিবারে গাওয়া হতো । ডিজিটাল যুগে এসব গানের কদর কমে আসছে। এখন মেয়েলী সংগীত গাওয়ার জন্য গ্রামের সেই শিল্পীদের আর ডাকা হয়না। এরকম একটি মেয়েলী গীত এখানে তুলে ধরা হল:

চল বইনারী মেন্দি গ তুলিতে
বদনে বদনে গোসাই রে
যাইরে আমরা দুইজনে
কেউ তোলে ডালে গ ডোলে
কেউ তোলে পাতা গ পোতা
জামাইর মা সুন্দরী গ তোলে

দুই কুলা সাজাইয়া রে
যাইরে আমরা দুইজনে[৬০]।

কবি জামিলা বেগম ও সাংবাদিক শাহানাজ মুন্সী ও কিছু মেয়েলী সংগীত সংগ্রহ করেন এবং বাংলা একাডেমি থেকে তা প্রকাশিত হয। নারীদের চিন্তা চেতনা ও তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি এই মেয়েলী গীতগুলো সংগ্রহের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে। **এ** গুলোর ওপর গবেষণা হলে এসব মেয়েলী গীত ধরে রাখা যাবে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন সমৃদ্ধ হবে। ব্রাহ্মবাড়িয়ার শিল্পীগণ লোকসংগীত, পালা গান, লোকগাথা, বাউলগান ও বিভিন্ন অধ্যাত্মিক ধারার গান করতেন ও এখনো করে চলেছেন। নিম্নে আঞ্চলিক শিল্পী দুলা মিয়া মাষ্টারের একটি গান তুলে ধরা হল[৬১]:

সাধের তিতাস নদীরে,
গাঙ্গ দইল ধোয়া পানি এক খান জাহাজ টানে
চল্লিশ খান রপ্তানী
তিতাস নদীর মাসে একখান
জাহাজ আসিল
কৈরা ইচ্ছা মুছ তাওয়াইয়া বসিয়া রহিল।
এমন সময় দাঁড়িমাল্লা
নোঙর তুলিল

---

৬০.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ২০৭

৬১.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ৭৬

ভাসিতে ভাসিতে জাহাজ
নারায়নাগঞ্জে গেল
ইছা বলে সাধ্যের জাহাজ
তিতাসেই বহিল।

মোহনলাল দাসের একটি গান:

প্রেমের কী যে জ্বালা গো যার জ্বালা সে জানে
লাগাইয়া পিরিতের ডুরি দুরে বসে টানে গো।।
সাধ করে প্রেম করেছিলাম আমি নিষ্ঠুর বন্ধুর সনে
আমার মিটিল না অভাগীর সাধ মরিব পরান গো।।
প্রেমের আগুন যার অন্তরে জ্বলে রাত্র দিনে
প্রেমিকা কি বাচেঁ কখন প্রেমিক সুজন বিনে গো।।
মোহনলাল কয় প্রেম করো না প্রেমের মর্ম নাহি জেনে
মর্ম জেনে প্রেম করিলে ভুলবে না জীবনে গো[৬২]।।

গীতিকার গীরিন চক্রবর্তীর কয়েকটি বহুল প্রচলিত গানের মধ্যে-

১। মাসির বাড়ি কিশোরগঞ্জে
মামার বাড়ি চাতলপাড়।
বাপের বাড়ি বাউনবাইরা (ব্রাহ্মনবাড়িয়া)
নিজের বাড় না আমার।।
আমি রে যে জলের টেউ

আমার বলতে নাইরে কেউ,

চান্দের হাট ভাউঙ্গা গেছে

একুল ওকুল অন্ধকার।।

আমি কই আমার আমার

তারা কয় না

ঠিঠি নাই পত্র নাই

খবর লয় না[৬৩]।

---

৬২.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ২৩০

৬৩.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ২৩৮

ঢাকার তারা আনল টাকা, মনে ভাবলাম ঘুরল চাকা

আইসা দেখি সবই ফাঁকা, পোড়া কপাল চমৎকার।

২। হো- নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া দে

ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া।

চলুক মাঝ দইরা দিয়া।

আরে উড়ালি বিড়ালি বাওয়ে নাওয়ের বাদাম নড়ে,

অথালি পাথালি পানি ছলাৎ ছলাৎ করে ।

আরে খল খলাইয়া হাইসা উঠে বৈঠার হাতল চাইয়া।

হাসে ঢেউয়ের তালে পাওয়ের ফালে নাওয়ের গলুই কাপে,

চির চিরাইয়া নাওয়ের ছৈয়া রোধ- তুফান মাপে-মাপ।

আরে  চিরলি চিরলি ফুলে ভোমর ভোমরি খেলেরে,

বাদল উদালী গায়ে পানিতে জমিতে হেলেরে

আরে  তুর তুরাইয়া আইল দেওয়া ঝিলকি হাতে লইয়া।

আইল ঝিলকি হাতে লইয়া।।

হো শালি ধানের শ্যামলা বনে হৈলাদা পংখী ডাকে,

চিক মিকাইয়া হাসেরে চাঁদ শরষা ক্ষেতের ফাঁকে-ফাঁকে।

আরে সোনালী রুপালী রঙে রাঙা হেইল নদী,

মিতালী পাতাইতাম মই মনের মিতা পাইতাম যদিরে।

আরে ঝিলমিলাইয়া ঝলের পানি নাচে থৈয়া থৈয়া[৬৪]।।

অন্যতম আরো একটি ভাটিয়ালি গান যা ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে বেশি গাওয়া হতো:

কে যাস রে ভাটির গাঙ বাইয়া

আমার ভাইধনরে কইও নাওর নিত বইলা

তো কে যাস কে যাস.....

---

৬৪.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ২৩৯

বছর খানি ঘুইরা গেল গেল রে
ভাইয়ের দেখা পাইলাম না পাইলাম না
কইলজা আমার পুইরা গেল গেলরে
ভাইয়ের দেখা পাইলাম না, পাইলাম না।
ছিলাম রে কতই আশা লইয়া
ভাই না আইল গেল গেল রথের মেলা চইলা।
প্রাণ কাঁন্দে কাঁদে
প্রাণ কাঁন্দে, কাঁন্দে প্রাণ কাঁন্দে রে প্রাণ কাঁন্দে
নয়ন ঝরে মরে নয়ন ঝরে রে নয়ন ঝরে
পোড়া মনরে বুঝাইলে বুঝে না ।
নির্দয় চিঠিরে তুমি সদয় হইয়া
ভাইরে আইনো নইলে আমার পরান যাবে জ্বইলা।
ভাটির চরের নৌকা ফিরা আইলো রে
ভাইয়ের খবর আনলো না আনলো না।
সুজন মাঝিরে ভাইরে কই ও গিয়া
না আসিলে স্বপনেতে দেখা দিত বইলা
তোরা কে যাস কে যাস[৬৫]।

এছাড়াও ভাটি অঞ্চলের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন গুণী শিল্পীর বিচ্ছেদের গান, দেহতত্ত্ব, রশিক গান, পুকুর কাটার খাইর, জারিগান ইত্যাদি। বাংলাদেশের আর্থ-সমাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এই গান গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে আসছে। এই গানগুলোর সংরক্ষণ অতি প্রয়োজন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের গুণিজন এই

গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীগণের বিষয়ে কথা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের বাগানবাড়ী নিবাসী সাবেরা সুলতানা ইমনের সাথে। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এই গুণীজনদের কালজয়ী গান সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি বাংলা বিষয়ে পাঠদান করেন মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউটে। তিনি আরো বলেন তাঁর এলাকার এই কালজয়ী গানগুলো টিকে থাকা খুব প্রয়োজন। তাঁর মতে, বেশি বেশি গবেষণা হলেই কেবল এসব গান সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

৬৫.শামসুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*; ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ২৪৬

পল্লী কবি সাহাব উদ্দিন:

‘কিশোরগঞ্জের লোক গানের প্রতিফলিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস’ নামক প্রবন্ধে ইতিহাস বিভাগের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক মেসবাহ কামাল ও তাঁর ছাত্রী সুরাইয়া আক্তারের লেখাটি পড়তে গিয়ে পরিচয় পেলাম কিশোরগঞ্জ জেলার পল্লী কবি শাহাব উদ্দিনের। লেখক দ্বয় তাঁর যে গানটি নিয়ে আলোচনা করেছেন সে গানটি মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক। তাঁর এই গানটি সংগ্রহ করে গেয়েছেন পাকুন্দিয়া উপজেলার পাইক লক্ষিয়া গ্রামের বাসিন্দা সোহরাব উদ্দিন। তিনি পেশাদার শিল্পী নন, খেটে খাওয়া এক জন দিনমজুর মাত্র। তিনি গানটি মুখস্ত ও আত্মস্থ করেন। পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয় এ গানটি। স্থানীয় ভাবে তিনি অসংখ্যবার এ গানটি পরিবেশন করে আসছেন। গানটিকে লেখকদ্বয় অধ্যায় ভিত্তিক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন-

১। পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন,দূর্নীতি ও আইয়ুব খানের সামরিক শাসন-

শাহাব উদ্দিনের গানটি শুরু হয় এভাবে[৬৬] -

গত তেইশ বছরে বাঙালীরে
করতো নির্যাতন।
কতো নেতা জেল খাটিল
আইয়ুবের কারন।

## ২। ছয়দফা, আগরতলা মামলা, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ও আইয়ুব খানের পতন[৬৭]

দেখেন কেমন করে।। শেখ সাবেরে

নিল কারাগারে

আগরতলা ষড়যন্ত্রে

ফেলিয়া তাহারে!!

কতো বেত মারে।।  হুকুম করে

ফাঁসির কাষ্ঠে দিতে।

সংগ্রামী নেতারা তখন

নামে সংগ্রামেতে।

---

৬৬.মোহাম্মদ নজিমুল হক (সম্পা.); *ইতিহাস চর্চায় বাচনিক উপকরণ*; (রাজশাহী: আই.বি.এস. ২০১৭) পৃষ্ঠা: ১০৭

৬৭.মোহাম্মদ নজিমুল হক (সম্পা.); *ইতিহাস চর্চায় বাচনিক উপকরণ*; (রাজশাহী: আই.বি.এস. ২০১৭) পৃষ্ঠা: ১০৭

জাগে ছাত্র শ্রমিক।। কৃষক সবই

নেতাগণ মিলিয়া।

শেখ সাবেরে বাহির করলেন

জেলখানা ভাঙ্গিয়া

হায়রে কত ছাত্র।। শহীদ হইল

আইয়ুবের গুলিতে

তবু নাহি ছাড়ে সংগ্রাম

গুলির ভয়েতে!!

যেমন যম আসিল।। আইয়ুব ভাবল

আরতো নাই উপায়।

ইয়াহিয়ারে রাজ্য দিয়া

আইয়ূবে পালায়!!

৩। ৭ মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চের গণহত্যা, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা:

লেখতে সেই কাহিনী (।।) চক্ষের  পানি

করে টলমল ।

কাগজ ভিজিয়া যায়

চলে না কলম (।।)

তখন স্থানে স্থানে মিটিং করে

শেখ মুজিবরে।

কানি আঙ্গুল দিয়া তখন জাগায় বাঙালীরে (।।)

হঠাৎ মিটিং খুইয়া (।।) (রেখে) যায় পালাইয়া

ইয়াহিয়া শয়তান।

শেখ সাহেবের বন্দীর অডার (অর্ডার)

দিল টিক্কা খান (।।)

টিক্কা ডি আই জিরে (।।) অডার করলো

জানাইলো ফোনেতে।

শেখ সাহেবরে বন্দি তুমি

কর এই মুহূর্তে (।।)

ডি আই জি ফোন করে (।।) সকল বিষয়

জানায় তাড়াতাড়ি।

আত্মগোপন করেন সবাই

বিপদ দেখে বারী (।।) (ভারী)

সঙ্গে ছিলো যারা (।।)রইল তারা

আত্নগোপন করে।

পালাইলো না জাতির পিতা

মেলেটেরির (মিলিটারী) ডরে।

শেখ সাব ধরা দিল (।।) বন্দী হইল

মেলেটারির হাতে।

কোথায় জানি লইয়া গেল

পচিশ মার্চের রাতে!!

৪। পাকিস্তানি সেনা ও দোসরদের নারী নির্যাতনঃ

টিইক্কার **(**টিক্কাখান**)** অডার পাইয়া **(।।)** ছিল যতো

খানের হানাদার।

সারা টাউন ঘেরিয়া পড়ল

পলকের মাঝার **(**এক মুহূর্তে**)**

হায়রে কত মা বইনেরে **(।।)** ল্যাংটা করে

ক্যাম্পের ভেতর।

আবদ্ধ করিয়া রাখছে

খানের হানাদারে!!

কত টিনের ঘর (।।) পানের বরে

ঢুকে রেজাকারে (রাজাকার)

কাটা ঘায়ে লবন দিলো

দেশের মিরজাফরে।

৫। গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ:

হায়রে মায়ের দুঃখ (।।) দেখতো যখন

পড়তো দুই নয়ন ঝরে

কেমন করিয়া আর

বসে থাকে ঘরে!!

তখন লাখো মায়ের (।।) লাখো সন্তান

ইন্ডিয়াতে গিয়ে।

গেরিলা ট্রেনিং নিলো

অস্ত্র হাতে লইয়া(।।)

৬। ভারতের ভূমিকা:

মোদের বন্ধু রাষ্ট্র (।।) প্রতিব (প্রতিবেশী) রাষ্ট্র

ভারত হিন্দুস্তান।

সাত কোটি বাঙালীর তুমি

বাচাঁইলা পরান (।।)

তোমারা যে সাহায্য (।।) করিয়াছ

এহি ( এই ) দুঃখ দিনে।

সেই কথা আর ভুলিব না

বাঙালী জীবনে। এদিকে শরনার্থী (।।) লাইয়া ভারত

পড়ছে বেকায়দায়।

ফিরাইয়া দেশে নিতে

বিশ্বরে জানায়(।।)

গানের এক পর্যায়ে পল্লি কবি শাহাব উদ্দিন, বিশ্ববাসীর কাছে আহবান করেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্মমতায় বাংলা যে শ্মশানে পরিণত হয় তা দেখে যাওয়ার জন্য-

এক বার দেখে আসুন (।।) বিশ্ববাসী

দয়া হলে মনে।

সোনার বাংলা পরিনত

হইয়াছে শ্মশানে।

মুজিবনগর সরকার:

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (।।) তাজ উদ্দীন

বাংলার জন্যে।

সব কিছু দিয়াছিলেন

বিজয় করিবেন(।।)

৮। গরিলা বাহিনীর অতর্কিত আক্রমন:

নামে মুক্তিসেনা (।।) কি নমুনা

দেখিতে না পায়।

বিজলীর মত গুলি কইরা

কই জানি পালায় (।।)

যত রেল, রাস্তা (।।)

নাই আস্তা

ছিল যত পুল ।

ডিনামাইট পুতিয়া সব

করিল নিস্ফল!!

যত টেলির (টেলিফোন ) তার (।।) রাখছে ( রাখেনি ) না আর

বন্ধ হইলে টেলি।

গেনেড ছাইড়া মারছে কতো

মেলেটেরির গাড়ী(।।)

৯। জাতিসংঘ ও বৃহৎ রাষ্ট্র/শক্তিবর্গের ভূমিকা ও  পাকিস্তান কর্তৃক

ভারত আক্রমণ:

যারা স্বয়ংসিংহ (।।) রাষ্ট্র সঙ্ঘ

কেউ না দিল সাড়া।

রইল চুপ করিয়া (।।) তখন হুমকি দিয়েছে

ইয়াহিয়া সরকারে।

দুই এক জায়গায় বোমবাট (বোমা ছড়ে মারা)  করে

ভারতের ভেতরে!!

তখন বাংলা ভারত (।।) হইয়া একমত

দিল মুক্তি সেনা।

মুক্তির সাথে এক মতে

বাংলায় দিল হানা।

যৌথ বাহিনীর সাফল্যের কথা পল্লী কবি শাহাব উদ্দিন তুলে ধরেন-

কতখানে বোমে (।।) ছোটে হায়রে

এলোপাথারি গুলি।

জলের জাহাজ ডোবায় কতো

এমনি বোম মেলি (।।)

চলছে বিমান যুদ্ধ (।।) হইল স্তব্দ

ইয়াহিয়ার কামান।

বোম ফালাইয়া বিমানবন্দর

করিল শ্মশান (।।)

## ১০। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বিপর্য্য:

তখন হানাদার (।।) যায় কুত্তা (কুকুর ) খায় কি

গাতার (গর্ত) ভিতর খাকে।

বাহিরে গেরিলারা বাঘা বাঘা ডাকে!!

তখন যার যার (যার  যার মত) মতে (।।) পালাইতে

লাগিল হানাদার।

প্রাণ বাঁচাইতে বেহুশ হইয়া

পথ ভুলে তাকালো ।

তখন এই সুযোগে (।।) গায়ের লোকে

লাঠি বাড়ি লইয়া (।।)

যেমন কুত্তা মারা আরম্ভ হইল

বাংলাদেশ জুড়িয়া (।।)

তখন নদী নালায় (।।) দেখা যায় কত মরা লাশ।

ফুইলা যেমন খাকি পোশাক হইছে কলার গাছ !!

দালাল মীর জাফর (।।) আল বদর

কতো মরছে ভাই।

রেজা (রাজাকার) মাইরা টাল (স্তুপ) ফালাইছে (ফেলেছে)

পকুন্দিয়া থানায়!!

নিয়াজী ফরমান গান্ধী (।।) পায়রা কান্দি

কহিল ইয়াহিয়া।

মিত্র সেনা মুক্তি সেনা

বাংলা যায় লইয়া!!

বলছে পল্লী কবি (।।) শাহাবদ্দিন

এইতো পড়লে ধরা ।

আর আসবেনা কোন কাজে

এই  সব আদা পরা (ছলছাতুরি)

দীর্ঘ নয় মাস  রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর চুড়ান্ত বিজয় লাভ করে বাংলাদশে । পাকিস্তান বাহিনী বাধ্য হয় ১৬ই ডিসেম্বরে  বাঙালিদের কাছে আত্মসমর্পন করতে, শাহাবুদ্দিনের ভাষায়ঃ

নিয়াজী ইহা শুনে (।।) ভাবে মনে

ছারে হাতিয়ার ।

ষোলই ডিসেম্বর তারিখে

করে সারেন্ডার!!

খবর রেডিওতে (।।) জনমতে (জনগনের কাছে)

দিল জানাইয়া।

আনন্দে উল্লাসেতে দেশ উঠিল মাতিয়া!!

অবশেষে তিনি বলেন:

যেমন রাত্র ছিলো (।।) ভোর হলো

আঁধার গেলো দূরে।

নতুন আলো জন্ম হলো

সমগ্র দেশের মুক্তিকামী জনতাকে উদ্‌ভুদ্ধ করতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যেমন অন্যতম ভূমিকা রেখেছিলো ঠিক তেমনি পাকুন্দিয়ার মতো একটি জায়গায় জনগন কে উদ্‌ভূদ্ধ করেছিলো এই গানটি তীব্রভাবে, খুজঁলে দেখা যাবে বাংলাদেশের অন্যান্য এমন আরো অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন প্রতিভা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যাঁদের প্রতিভার সাক্ষর গুলো সংরক্ষণ না করলে তাদের প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে, তাদের প্রতিভাকে অবজ্ঞা করা হবে বলে আমি মনে করি। তাই আমার গবেষণার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আঞ্চলিক শিল্পীদের ভাটিয়ালি সংগীত

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

শিল্পী অমরশীলের বাসগৃহে

গীতিকার খায়রুল আলম বাদলের সাথে আলাপকালে

# তৃতীয় অধ্যায়:

## বিনোদনের ধারা হিসেবে ভাটি অঞ্চলের গান:

বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে আছে ভাটির গান। বহু সাধুসন্যাসী, আউল-বাউল, পীর-ফকির, সাধক-বৈষ্ণব এসেছেন এই দেশে। লালন ফকির, সিরাজ সাঈঁ, হাছন রাজা, পাগলা কানাই, গগন হরকরা, দুদ্দুশাহ, ইদুঁ বিশ্বাস, মাহিন শাহ, পাঞ্জুশাহ, উকিল মুন্সী, শাহ আব্দুল করিম সহ নাম না জানা আরো কত সাধক তাঁদের কৃতিত্ব বিলিয়ে দিয়ে আমাদের বিনোদনকে করেছেন সমৃদ্ধ । বাউল গানে পঞ্চ পণ্ডিত বলে খ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানের জগৎকে করেছেন বিশ্ব সামদৃত। তাদের গান যেমন সঙ্গীত ও সাহিত্য কে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি ধর্মীয় চেতনা ও বিকশিত হয়েছে।

গান মানুষকে যেমন উদাস করে, বাউল করে উপলব্ধি শক্তিকে জাগ্রত করে তেমনি মানুষের মানবিকতাকে সমুন্নত রাখে। তাইতো আমাদের পূর্বসূরীরা গানকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন বিনোদন হিসেবে এই ধারাকে অব্যহত না রাখতে পারলে শাহিনুর রেজার মতো বলতে হবে আমরা চতুষ্পদ জন্তু হতেও স্থুল । ভাটি অঞ্চলের গানগুলো ভাটির মানুষের প্রাণের খোড়াক যোগায়। গানের ভেতরেই গান পাগল মানুষজন নিজের স্বরুপ খুঁজে পায়।

সংগীত যার অন্তরকে নাড়া দেয় না, সে অসম্পূর্ণ, সমতাবিচ্যুত, আধ্যাত্মিকতা বর্জিত এক মনের দিক দিয়ে উট,পশুপক্ষী এমনি সকল চতুষ্পদ জন্তু থেকে অধিকতর স্থুল[৬৮]। এই উক্তিটি করেছেন শাহীনুর রেজা। যার সম্পাদনায় ‘সংগীত ধর্মের আলোকে’ বইটি রচিত হয়েছে।

তাই আমাদের কাছে গান একটি অন্যতম বিনোদন। আর বিনোদনের প্রধান ধারা হিসেবে ভাটি অঞ্চলের গান অন্যতম একটি মাধ্যম বলা অতুক্তি হবে না।

শিল্পীর জীবন মাত্রই সহজ সরল, জ্ঞানী অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন তবু সমাজে তাদের তেমন কোনো মর্যাদা নেই পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাদের শিল্পকর্ম কালের  গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অথচ বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে এই শিল্পীগণ গানকে বাঁচিয়ে রাখেন। গান মানুষের মনে আনন্দ জাগায়। ভাটি অঞ্চলের গান শুধু ভাটি অঞ্চলেই নয় সমগ্র বাংলায় সমান জনপ্রিয়।

বিনোদনের প্রধান ধারা হিসেবে ভাটির গানের ভূমিকা তাই অন্যতম। ভাটির গানে যদিও প্রেমই মুখ্য বিষয়। তারপর**ও** সাধারণ কৃষক, মাঝি মাল্লার কথা, সাধারণ জনগণের সুখ-দু:খ, বিরহ-বেদনা, ভক্তি ভালোবাসা ও এ গানের বিষয়। ভরা বর্ষায় মাঝির কণ্ঠে যখন ভাটিয়ালী গান কেউ শোনেন তখন শ্রোতা মাত্রই মুহূর্তেই উদাস হয়ে যাবেন। ভাটির গানের বিভিন্ন শাখা যেমন- মেয়েলী সংগীত, পালাগীত, কবিগান, ঘেটুগান, বাউল সংগীত, কার্তীক সংগীত, শিব সংগীত, জারী গান, সারি গান, ধামাইল ইত্যাদি।

---

৬৮.শাহিনুর রেজা (সম্পা.); *সংগীত ধর্মের আলোকে*; (ঢাকা: অঙ্কুর, ২০০৫) পৃষ্ঠা: ১২৫

ভাটি অঞ্চলে সহজ সরল এই মানুষগুলো যখন খুশিতে কোন ভাটিয়ালী গান ধরে, তখন সে গানের কথাও তার মনের আবেগের সাথে মিলে

যায়। যখন তারা প্রিয় বিরহে কাতর হয় তখনো ভাটির বিরহী তাদের মনের কথা গুলো খুজে পায়। কেউ যদি আধ্যাত্মিকতায় মগ্ন থাকতে চায় সেখানেও রয়েছে ভাটির গানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। কোন বিষয় নেই ভাটির গানে? প্রেম, বিরহ, আধ্যাত্মিকতা, দেহতত্ত্ব, বাউল আঙ্গিক? সব কিছুর মেল বন্ধন খুজেঁ পাওয়া যায় ভাটি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে। তাই তাদের মন এতো আর্দ্র। উজান থেকে গড়িয়ে পরে পানি ভাটিতে, আর সেই ভাটিতেই ভাটিবাসীর বাস। তাই তাদের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম ও ভাটি অঞ্চলের গান।

আনন্দ-উৎসব, লোকপার্বণসহ নান ধরনের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ভাটির গান দাপটের সহিত নিজের জায়গা করে নিয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়, বিরহ ভুলিয়ে রাখে, আশা জাগায়। আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্বের গানগুলো মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেয়, নিজের ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখে। ফলে সংগীত প্রেমী ব্যক্তি কখনোই নিষ্ঠুর হতে পারে না। ভাটি অঞ্চলের জারী ও সারি গান গুলো মানুষের মধ্যে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি করে। সংগীতের মাধ্যমে মানুষ অনেক বার্তা পেয়ে থাকে। ভাটির

গানগুলো মানুষের মানবিকতা বোধকে জাগ্রত করে মানুষকে মানুষের প্রতি সহমর্মী করে তোলে। তাই আমি বলবো বিনোদনের প্রধান ধারা হিসেবে ভাটির গানের ভূমিকা অন্যতম।

# চতুর্থ অধ্যায়:

## ভাটি অঞ্চলের গানে আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ব:

ভাটি অঞ্চলের গানে আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্বের প্রচুর উপকরণ রয়েছে। ভাটির প্রতিটি জেলাতেই আনাছে কানাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে গুণী সব প্রতিভা। জালাল উদ্দিন খাঁর জালাল গীতিকা-১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড জুড়ে বেশির ভাগ গানই আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্বের গানে ভরপুর। সৃষ্টিকর্তাকে আমরা সবধর্মের মানুষের পরম আরাধ্য হিসেবে আরাধনা করি। আর তাঁকে নিয়ে আমরা যে গান বাঁধি বা গাই সে গুলোই হলো আধ্যাত্মিক ধাঁচের গান।

সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৃষ্টিকর্তার আরাধনাই হল এসব গানের মূল বিষয়। সংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছেন- সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব এ সকল তত্ত্বকেই আমরা এক কথায় দেহতত্ত্ব বলে থাকি। শিল্পী অমরশীলের বেশির ভাগ গানে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া আছে। হাছন রাজা, শাহ আব্দুর করিম, উকিল মুন্সী, মোহনলাল দাস, গিরিন চক্রবর্তীর গানে আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান। গানগুলো মানুষের মাঝে নৈতিকতা জাগায়, মানুষের মানবিকতা বোধকে জাগ্রত করে। নিম্নে দেহতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতামূলক কিছু গান তুলে ধরা হলো: যার গীতিকার ছালেক:

জীবন ভরে বাজাইলাম তরে
আরতো জানে কোলাইনারে
আমি আর কতো বাজাইবো তরে।।

শিশু কালে ছিলাম ভালো কিছু বুঝি না
আল্লার হাতে ছিলাম আমি ছিলাম তখনা।

এখন যৌবনকালে হাতে ধরে
বুকেতে মিশাইলাম তোরে
আর কত বাজাইবে তোরে
যতই দেখ আপন আপন
আপন কেহ নাই
চোখ বুঝিলে ঘোর অন্ধকার
পাগল ছলেক বলে মুর্শিদ তোমার
ঐ নাম বীনে গতি নাই।

আমি আর কত বাজাইব তরে[৬৯]।।

৬৯.শামছুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা,* ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ২৫০

নেত্রকোনা অঞ্চলের আরেকটি দেহতত্ত্বের গান নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আসমান কালা জমিন কালা আরো কালা পানি
দেহের মধ্যে বিরাজ করে লাল নীল মণি
কালার নাম শুইনারে আমি হইলাম উদাসী।

দুধ মিঠা দধি মিঠা আরো মিঠা পানি
বন্ধের মিঠা হইলাম আমি বন্ধের প্রাণে চাইয়া
কালার নাম শুইনারে আমি হইলাম উদাসী।

দুধ তিতা দধি তিতা আরো তিতা পানি।

বন্ধের তিতা হইলাম আমি জবান হইল ভাটি
কালার নাম শুইনাবে আমি হইলাম উদাসী।

ছায়া পাইবার আশে গেলাম হইবল বৃক্ষের তলে
পত্র ছেদে রৌদ্র লাগে আপন কর্ম দোষে
কালার নাম শুইনারে আমি হইলার উদাসী।

নদী পার হইবার আগে গেলাম বড় নদীর পাড়ে
আমায় দেইখে কালো নৌকা থাকে দূরে দূরে
কালার নাম শুইনারে আমি হইলাম উদাসী[৭০]।।

এই গানে শিল্পী কালা বলতে নিজের মন ও বিবেককে বুঝিয়েছেন। গীতিকার ও সুরশিল্পী জালালউদ্দিন খাঁর একটি দেহতত্ত্বের গান নিম্নে প্রদত্ত হলো:

দেহে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র কই রাখনি মন তার ঘরে

আকাশ পাতাল সাগর পাহাড় লইয়া ঘুরে  নিরন্তর।।

উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ হয় তার পূর্ব পশ্চিম ফাঁড়ে

আসা যাওয়া করে মানুষ উত্তরের দুয়ারে

---

৭০.শামছুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকসংগীত কেন্দুয়া অঞ্চল,* (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩) পৃষ্ঠা: ০৭

দক্ষিণ দিকে ভাটি রাজ্য মাল রপ্তানি এ জীবন ভর।।

পাঁচের পূরণ পঞ্চবিংশ আঠারোটি স্হানে
চতুর্বিংশ তত্ত্বের উদয় চতুর্দশ ভূবনে
আত্না লইয়া মন পরাণে রঙে বানছে এই বাড়ী ঘর।।

আগের দিনে সদর দরগীর মালের হয় আমদানী
মফস্বলে পরের দিনে হয় সে রপ্তানি।

আছে সবারে জনাজানি নিতে চায় না কেউ তার খবর।।

বহ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র আর মিত্র প্রজাপতি
কাজে ব্যস্ত পঞ্চেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন গতি
কোথায় রাহ কারে বসতি তাদের গিয়া চিনাক্ত কর।।

তারা যদি রয় পুলকে শাস্তি মিলাব ভবে
জালালের পূর্ণ শাস্তি কোনদিন জানি হবে
যার তার ভাবে সবেই যাবে লোক চক্ষের আগোচরে।।

এই গানগুলো বাঙালির প্রাণের গান। গানের গীতিকারগণ নিরক্ষর অথবা স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন। ভাষার মার্জনা বা অলংকারের ও কোন চেষ্টা নেই, তবুও গানগুলো কত প্রাণবন্ত। ভাটি অঞ্চলের গানে আধ্যাত্মিকতা ছোঁয়া বহুলাংশে লক্ষ করা যায়। শিল্পী জালাল উদ্দিনের একটি গীতিকা তুলে ধরা হল:

খ্যাপসে জালাল রুহে কামাল আলেপ আল্লা এক জায়গায়
খুদি না আগাইলে খোদা চিনবার কিছু নাই উপায়।।
আমি তুমি বলছি কারে পাইলাম না সেই পরিচয়
ঠিকের হিসাব ধরে নিলে আমি যে আর কিছুই নয়।।
ফুলে নিয়া কুলেতে রয় দুনিয়াতেই ঘেরাও মমতায়।।

যেখানে রয় ক্ষুধা তৃষ্ণা তার উপরে মন কানা
খোদা বন্ধ খুদির মায়ায় দুধে রহে মাখন ছানা
কাঁচা লোহার শান ধরে না পাগল ভরতে যাই কোথায়।।
আজ দিবে কাল দিবে বলে ঘুরাইয়া নেয় এ জীবন
করলে আত্ন সমর্পন শেষে টাকা পয়সা চায়।।
নিজেকে নিয়া একশি টান মন রাখ তার পিপাসু
দমে দমেই জগতে থাক আল্লাহ আল্লাহ
তাহলে তোর নিজের' রুহ দেখা দিবে নিরালয়।।

শাহ আব্দুল করিমের 'জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বল ওগো সাই গানটিতে আধ্যাত্মিকতার আমেজ রয়েছে:

জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বল ও গো সাঁই
এ জীবন যত দুঃখ কে দিয়াছে বল তাই,
জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বল ও গো সাঁই।।
দোষ করিলে বিচার আছে সে ব্যবস্থা রয়ে গেছে
ক্ষমা চাই না তোমার কাছে, তোমার কাছে উচিৎ বিচার চাই।
দোষী হলে বিচারে সাজা দিবা তো পরে
এখন মারো অনাহারে কোন বিচারে জানতে চাই
জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বল ও গো সাঁই।।
একি তোমার বিবেচনা কাউরে দিলা মাখন ছানা
কারো মুখে অন্ন জোটেনা ভাঙা ঘরে ছানি নাই
জানো শুধু ভোগ বিলাস, জানো গরিবের সর্বনাশ
কেড়ে নেও শিশুর মুখের গ্রাস মনে বড় দুঃখ পাই
জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বল ও গো সাঁই।।
তোমার এসব ব্যবহারে- অনেকে মানেনা তোমাকে
কথায় কথায় তুচ্ছ করে

আগের ইজ্জত তোমারে নাই্
রাখতে চাইলে নিজের মান
সমস্যার কর সমাধান
নিজের বিচার নিজে কর
আদালতের দরকার নাই
জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বল ও গো সাঁই।।
দয়াল বলে নাম যায় শোনা
কথায় কাজে মিল পরেনা
তোমার মান তুমি বোঝ না
আমরা তো মান দিতে চাই।
তুমি আমি এক হইলে পাবে না কোন গোলামলে
বাউল আব্দুল করিম বলে আমি তোমার গুনগাই
জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বল ওগো সাই
এ জীবনে যত দুঃখ, কে দিয়াছে, বল তা-ই[৭১]।

---

৭১.থিন হান মং (তিথি), *জীবন্ত কাংবদন্তী বাউল শাহ আব্দুল করিম, অডিও এলবাম; (ঢাকা সাউন্ড মেশিন প্রকাশনা- ২০০৬)*

# ৫ম অধ্যায়:

## লালনের গানের সাথে ভাটি অঞ্চলের গানের যোগসূত্র:

ফকির লালন সাইজীর পরিচিতি এখানে নতুন করে তুলে ধরার কোন প্রয়োজন নেই, বলেই আমি মনে করি। লাল সাঈঁ সর্বজন বিদিত। তাঁর মানবধর্ম ও মানবকর্মের কল্যাণের জন্য। ধর্মের চেয়ে মানবতা বড়, তিনি তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণ করে করেছেন। বাউল সাধক ও গায়কগণের মধ্যমণি লালন সাঈঁ। তাঁর জীবন কাল ধরা হয ১৭৭৪-

১৮৯০ পর্যন্ত। ধর্মীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে নিজেকে রেখেছেন পর্দার আড়াল। তিনি ছিলেন সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। লালনের গাণে যুক্তি ও প্রতিবাদ দুটোই আছে। স্রষ্টাও মানুষের মাঝে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ, তাই তাঁর কোন মন্দির ও মসজিদের অনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট জুড়ে তার প্রতিভার ব্যাপ্তিকাল বা বিকাশ কাল। কত উঁচু মানের চিন্তা করতেন তিনি। যার **ফস**ল হিসেবে আমরা গাই তাঁর **য**ত অসাধারণ গান। লালনের গানের সাথে ভাটির গানের যোগসূত্র রয়েছে অনেকখানি । লালন তার গানে বলেছেন-

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ পাবি
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি...[৭২]

ভাটি অঞ্চল নেত্রকোনার বাউল শিল্পী ও সাধক রশিদ উদ্দিন তার গানে বলেছেন-

মানুষ ধর মানুষ ভজ,
শুন বলিরে পাগল মন
মানুষের ভিতরে মানুষ করিতেছে বিরাজন।।

আবার জালাল উদ্দিন খাঁ তার গানে বলেছেন:

মানুষ থুইয়া খোদা ভজ,
এই মন্ত্রণা কে দিয়েছে
মানুষ ভজ কোরান খুঁজ
পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে[৭৩]।।

আবার লালন বলেছেন-

সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে।

পাবিরে অমূল্য নিধি বর্তমানে।।

লালন ইহজীবনে সব কিছু জানতে চাইতেন তার গানের মাধ্যমে যেমন-

---

৭২.আবদুল ওয়াহাব; *বাংলাদেশের লোকগীতি (ঢাকা; বাংলা একাডেমি; ২০০৭), পৃষ্ঠা: ২৯৫*

৭৩.শামসুজ্জামান খান (সম্পা); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা; নেত্রকোনা (ঢাকা; বাংলা একাডেমি; ২০১৩), পৃষ্ঠা: ১৪৬*

মলে পাব বেহেস্তখানা

তা শুনে তো মন মানে না
বাকির লোভে নগদ পাওনা
কেউ ছাড়ে এই ভুবনে।।

ভাটি অঞ্চলের গানের সাধক পুরুষ শাহ আব্দুল করিম বলেছেন-

তোমার এসব ব্যবহারে- অনেকে মানেনা তোমাকে
কথায় কথায় তুচ্ছ করে
আগের ইজ্জত তোমারে নাই্
রাখতে চাইলে নিজের মান
সমস্যার কর সমাধান
নিজের বিচার নিজে কর
আদালতের দরকার নাই[৭৪]।

তাঁর গানে মনে হয় তিনি সরাসরি কথা বলছেন সৃষ্টিকর্তার সাথে, তাঁকে সামনে রেখে প্রশ্ন করছেন। লালনের গানের সাথে তার গানের যোগসূত্র এ ধরনের গান গুলোতে খুঁজে পাওয়া যায়।

দেহঘড়ির ভেতর দমের আশা যাওয়া নিয়ে লালন বলেছেন-

খাঁচার ভেতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়[৭৫]।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভাটি শিল্পী সৈয়দ আব্দুর বারী বলেছেন-

হায়রে পিঞ্জিরার ধন পাখি
একই ঘরে বসত কইরে
আমারে দাও ফাঁকি[৭৬]।।

ভাটি অঞ্চলের শিল্পী অমর শীল বলেছেন-

মনের মাঝে মন চোরায়
হাওয়ার সনে আসে আর যায়।

পরপারের ভাবনায় যখন লালন নিমজ্জিত থাকতেন তখন গাইতেন

পথেরো গোলমালে পড়ে
যুবলাম কুপজলে মাঝারে
লালন বলে কেঁনে ধরে,কূলে নাও গুরু আমায়।

---

৭৪.থিন হান মং (তিথি), *জীবন্ত কাংবদন্তী বাউল শাহ আব্দুল করিম, অডিও এলবাম; (ঢাকা সাউন্ড মেশিন প্রকাশনা- ২০০৬)*

৭৫.দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *সিলেট বিভাগের ইতিহাস; (ঢাকা: দশদিশা, ২০০৬) পৃষ্ঠা:২০১*

৭৬.শামছুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা,* ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ২৩০

# ৬ষ্ঠ অধ্যায়:

## ভাটির গানে কী পরিবর্তন এসেছে ও করণীয় কী:

কালের আবর্তে ভাটি অঞ্চলের গানগুলো ক্রমে ক্রমেই জৌলুশ হারাচ্ছে। গান রচনার ক্ষেত্রে ভাষার ক্ষেত্রটা ছিলো সম্পূর্ণ আঞ্চলিক, অর্থাৎ ভাটি অঞ্চলের ভাষাগুলো অঞ্চলভেদে যেমন হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের শিল্পীগণ মূল ভাষাকে বিকৃত করে নিজের মতো করে ভাটি অঞ্চলের গানগুলো গাওয়ার চেষ্টা করছেন। ফলে ভাটির গানগুলো তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। ভাটি অঞ্চলের গানে আঞ্চলিকতার ছাপ থাকবে এটাই স্বাভাবিক, ভাষাই ভাটির গানের মৌলিক উপাদান। যেমন ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের একটি বিয়ের গীত-

আয়লো পুলাপুরি টুলিমুচি লইয়া
আরতো খেলতাম না পরের ঘরো গিয়া

পরের বাপে নিতো আইবো

জলিদান দাইয়া।

জলিদানের কিরামরি

বন্দের পুকে খায়

আমার এতো আদরের বইন

পরে লইয়া যায়[৭৭]।

নেত্রকোনার কেন্দুয়া অঞ্চলের একটি ভাটির গান এখানে তুলে ধরা হলো:

অ ময়নার মা দেখবেনি

আমার লগে যাইবেনি

কী সুন্দর ঢাকার শহর

বাংলাদেশের রাজধানী[৭৮]

---

৭৭.শামছুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা,* ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃষ্ঠা: ২২১

৭৮.শামছুজ্জামান খান (সম্পা.); *বাংলাদেশের লোকসংগীত কেন্দুয়া অঞ্চল,* (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩) পৃষ্ঠা: ৩০

সুনামগঞ্জ জেলার শাহ আব্দুল করিমের একটি গান:

ছলে ছানিত কামলা চাচা দিলায় না

মাইয়ে করলা মুরোগ জব

আইয়া তুমি খাইলায়না।

করিমের তুমি মন্দ কইও

মন থকি ইতা বাদ দেলাইও

ইতা কথা মনে রাখা বড় ভালা না।

কিশোরঞ্জের শিল্পী,গীতিকার ও সুরকার খায়রুর আলম বাদল তার একটি গানে বলেছেন-

যার লাগিয়া পরান কান্দে

সে যে থাকে উজানে

সে যে আমারে বুজান এর ননদী

প্রাণ সখি গে-

বৈশাখে মাসে ধান উঠায়া

আষাঢ় মাসে দিবো বিয়া

মৌলভীবাজার জেলার প্রাচীন উপাখ্যান কমলা রানীর দীঘির উপর ভিত্তি করে যে গান রচিত হয়েছে তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল:

ও আমার প্রানের কমলা গো

আমার সাধনার ধন গো

আর করতাম নায় এজাত ভুল কাম

একবার তুমি চাইয়া দেখ

ভিখারী তোর সাথে[৭৯]।

৭৯.মোহাম্মদ মুমিনুল হক, সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত; (ঢাকা; গতিধারা: ২০১০) পৃষ্ঠা: ৩৭৮

হবিগঞ্জের জেলার মিরাশী গ্রামের বিপ্লবী সাধক পুরুষ সুরকার ও গীতিকার হেসাঙ্গঁ বিশ্বাসের একটি গান এখানে তুলে ধরা হলো:

হবিগঞ্জের জালালী কইতর
সুনামগঞ্জের কুরা
সুরমা নদীর গাংচিল আমি
শুন্যে দিলাম উড়া[৮০]।।

সিলেট জেলার ফুলবাড়ী গ্রামের শাহ আব্দুল ওহার তার একটি পুঁথি গানে বলেন-

মওলানা মোহম্মদ আজিম
সর্বলোকে জানে
পূর্ব শহরে কুতুবী আল্লাহ

দিয়াছিলো তানে ।
শরিয়ত মারিফতের বৃক্ষের ছিল ফুল
ফুলবাড়িতে গদ্দি ছিল আল্লার মকবুল।

প্রতিটি গানের ভাষা যার যার অঞ্চলের পরিচয় বহন করে। বংশ পরম্পরায় গীতিকারগণের পরিবার পরিজনের। এসব গান গেয়ে আসছেন। আঞ্চলিক শিল্পীগণের মধ্যে অনেকেই যার যার নিজের অঞ্চলের আঞ্চলিক গান চর্চা করছেন। কিন্তু কালক্রমে এসব গানের সঠিকতা থাকছে না। যন্ত্রের আওয়াজের মাঝে গানের কথা গুলো

শ্রোতার কানে পৌঁছাচ্ছে কতটুকু। সনাতন বাজনায় এই গানগুলো আর গাওয়া হচ্ছে না। এশিয়াটিক সোসাইটী ৬৪টি জেলার আঞ্চলিক গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলো যা পরবর্তীতে C.D আকারে প্রকাশ করেছিলো। বিপুলভাবে সমদৃত হয়েছিলো C.D গুলো বিদগ্ধ মহলে। আমার নিজের সংগ্রহে আছে C.D গুলো। একেবারে সনাতনী বাজনায়। আঞ্চলিক ভাষায় গাওয়া এই গানগুলোতে তাদের নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। এরকম অনেক ধরনের আয়োজন আজ খুব প্রয়োজন।

বাংলা একাডেমি এই আঞ্চলিক গানগুলোর উপর অনেক গবেষণা করেছে ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। ভাটি অঞ্চলের গানের উপর আলাদা করে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, বা গবেষণা হয়নি। গবেষণা করতে গিয়ে এই উপলব্ধি আমাকে তীব্রভাবে ব্যথিত করেছে। ভাটির জেলার কিশোরগঞ্জের সন্তান হিসেবে আমি চাই আগ্রহী গবেষকগণ এর ওপর গবেষণা করুক । ভাটি অঞ্চলের গানগুলো বিকৃত ভাবে যেন উপস্থাপিত না হয় এবং তার নিজস্বতা যেন বজায় থাকে। প্রচুর গবেষণা হলে ভাটির গানগুলো হারিয়ে যাবে না, বিকৃত হবে না। ডিজিটাল যন্ত্রের শব্দের নিচে ঢাকা পরবে না বলে আমার বিশ্বাস।

---

৮০.হেমাঙ্গ বিশ্বাস; *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সংগ্রহ ১,* (কোলকাতা: দে'জ, ২০১২) পৃষ্ঠা: ১২৯

## ৭ম অধ্যায়:

## ভাটি অঞ্চলের গান গুলোকে কিভাবে সংরক্ষন করা যায়:

মাটির ঘ্রানে, প্রানের টানে, নাড়ীর টানে আমরা বার বার ছুটে যাই আমাদের শিকড়ের কাছে, খুঁজে ফিরি শৈশব, এই তো আমাদের সংস্কৃতি। আর এই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে আঞ্চলিক গান। আর অত্র গবেষণার বিষয় হল- ভাটি অঞ্চলের গানঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা (২০শতক) এই বিষয়টির উপর গবেষণা করতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি যে সেই সব গুণী প্রতিভার গনের অমর সৃষ্টিগুলো সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে। কত শত অসাধারণ গান রচনা করেছেন ভাটি অঞ্চলের গীতিকার গণ। তাদের মধ্যে অনেকেরই প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই, নেই কোন পারিবারিক আভিজাত্য । তাদের মধ্যে অনেকেই সামান্য অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন কেউ বা লিখতেও জানেন না। যারা লিখতে জানতেন না তাদের গানগুলো পরিবারের কেউ বা তাদের কোন শিষ্য মুখেমুখে মুখস্ত করে টিকিয়ে রেখেছেন এখনো। গুণী গীতিকারগনের মধ্যে অনেকের পুরো

জীবনই কেটেছে চরম অর্থকষ্টে, আবার কারো বা জীবন ছিলো দারুণ বিলাসিতা ও প্রাচুর্যে ভরপুর ।

ভাটি অঞ্চলের সেই মহান প্রতিভাগণের সৃজনশীলতা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। যে আর্থ-সামাজিকও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এই গানগুলো রচনা করেছেন সে সমাজের ছবি আমরা তাদের গানের মাঝেই খুজেঁ পাই। হাজার বছর ধরে আমাদের প্রাণের মাঝে লালিত এই গানগুলো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কে ঐতিহ্যমণ্ডিত করে রেখেছে। আর এই ঐতিহ্যের ধারক বাহক ভাটি অঞ্চলের গানগুলো সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে। লক্ষণ সেনের রাজত্ব কালের সময়কার সংগীত ঐতিহ্য, জয়দেবও তার স্ত্রী পদ্মাবতীর অসামান্য প্রতিভা, চর্যা গীতিকা মোগল আমলের সংগীতাঙ্গন, এরপর চিরায়ত বাংলাগানের যুগান্তকারী  অধ্যায় বাঙ্গালী মাত্রই জানেন । বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম ঈশা খাঁর আমলে তিনি ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিশেষ করে কিশোরগঞ্জে অবস্থানকালে ভাটির সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সমৃদ্ধ এই ভাটি অঞ্চলের সংস্কৃতির কথা আজ সর্বজন বিদিত।

বাংলা গানের অন্যতম আরেকটি অধ্যায় এই ভাটি অঞ্চলের গান । ভাটি অঞ্চলের মানুষের সহজ-সরল হৃদয়ানুভূতির কথা বলে এই গান গুলো। বাঙ্গালী ভাব, আবেগ, জীবন, সংগ্রাম, ইচ্ছা, সামাজিকতা,

প্রেম-প্রীতির প্রতিফলন দেখা যায় এই গানে। ভাটি অঞ্চলের গানগুলোতে সে অঞ্চলের মানুষের প্রাণের স্পন্দন শুনতে পাই। ভাটি অঞ্চলের গানের মূল আকষর্ণ তার সুরে ও কথায়। ভাটি অঞ্চলের মানুষের চেতনা, সংবেদনশীলতা, মানবিকতা, সমাজ সচেতনতা, জাতীয়তাবাদ, গণতান্ত্রিকবোধ এসবের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায ভাটির গানে। তাই ভাটির গানের উপর গবেষণা হওয়া একান্ত জরুরি । রবীন্দ্রনাথ গানের মাঝে পৃথিবীকে জানবার চেষ্টা করে বলেছেন-

গানে ভেতর দিয়ে যখন দেখি ভূবন খানি
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি।।

কারণ মানুষ গান শুনে মুগ্ধ হয়, আনন্দ পায়। গান পছন্দ করে না এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কম। তাই আমি মনে করি গানের ওপর গবেষণা করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত পছন্দের জায়গায় মানুষ সব সময় ভালো সফল হয়।

ভাটির গানের উপর অনেক বেশি বেশি গবেষণা হওয়া উচিৎ। গবেষণা হলে ভাটির গানগুলো সংরক্ষিত হবে এবং গানগুলো আজীবন ঠিকে থাকবে। সরকারি নির্দেশনা থাকলে শিল্পকলা একাডেমী গুলোতে গানের ওপর গবেষক নিযোগ দেয়া যেতে পারে উক্ত গবেষক তাঁর নিজের জেলার রচিত গানগুলো তৃণমুল পর্যায় থেকে সংগ্রহ করে বই

আকারে প্রকাশ করে শিল্পকলায় সংরক্ষণ করবেন। জেলা পাবলিক লাইব্রেরিতে সেই বই থাকবে। এ বিষয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। আমাদের দেশে মুলত গবেষনা করা হয় ডিগ্রি অর্জন এর জন্য। এখানে মুখ্য কাজ হবে সুষ্ঠুভাবে গবেষণা। একটি গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে ডিগ্রি অর্জিত অবশ্যম্ভাবী। তাই ভাটির গানের উপর সুষ্ঠু গবেষণাই এখানে মূখ্য। তাই আগ্রহী গান প্রেমী ব্যক্তিই পারে ভাটি গানগুলোর উপর গবেষণা করে ভাটির গান গুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে।

বাংলা একাডেমি ও এশিয়াটিক সোসাইটির পাশাপাশি পাবলিক লাইব্রেরি ও শিল্পকলা একাডেমি সর্বপরি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য বলে আমি মনে করি। তাহলেই হাজার হাজার বছর টিকে থাকবে আমার প্রাণের ভাটির গান। ভাটি অঞ্চলের গানের উপর তথ্য সংগ্রাহকগণের মধ্যে অনেকের সাথে কথা হয়েছে আমার এই গবেষণা বিষয়ে। নেত্রকোনা অঞ্চলের তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের শিল্প ও সংস্কৃতির তথ্য সংগ্রাহক, প্রাবন্ধিক ও অন্যতম গবেষক আলী আহম্মদ খান আইয়োব এর সাথে যখন কথা হয় তখন তিনি আমার সাথে একমত হন যে, ভাটি অঞ্চলের গানগুলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। অবস্য তিনি তাঁর এলাকার তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্খা থেকেই কারন তিনি সে

সব গানের যথার্থ সমঝদার। এমন সমঝদার শ্রোতাই পারেন ভাটির গানের সংরক্ষণ কাজে এগিয়ে আসতে। ভাটির গান ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের আকুতি তাদের জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। আমি মনে করি মানুষের আনন্দানুভূতির মূল উৎস সংগীত। সংগীত মানুষের মনকে উদার ও কুসংস্কার মুক্ত করে। আর এই লক্ষেই আবহ মান বাংলার ভাটি অঞ্চল সহ সমগ্র দেশের আঞ্চলিক সংগীতগুলোর সংরক্ষণ কাজ শুরু করা উচিৎ। বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, তার উপর গবেষণা করে, এ বিষয়ে তারাই সবচেয়ে বেশি প্রশংসার দাবিদার। বাংলা একাডেমির এই তত্ত্ব সম্বলিত গ্রন্থগুলো পাঠ করলে বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। বাংলা একাডেমির এই গ্রন্থগুলো পাঠক ও শ্রোতাদের কাছে অমূল্য সম্পদ। সমাজের মানুষের সুখ-দু:খ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-মিলন এর প্রতিচ্ছবি ভাটি অঞ্চলের এই গানগুলো গবেষণার মাধ্যমে সংগ্রহ করে টিকিয়ে রাখলে আজীবন টিকে থাকবে, বিশ্বের সংগীত দরবারে সমাদৃত হবে ভাটি অঞ্চলসহ সমগ্র বাংলা।

# উপসংহার:

## ভাটি অঞ্চলের গানের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা-

অত্র গবেষণায় এই বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে মূলত আমি নিজে এই ভাটি অঞ্চলের সন্তান এই তাগিদ থেকেই। ছোট বেলায় আমার দাদার মুখে অনেক পুঁথি শুনেছি। পুঁথির ভেতরকার শব্দ ও এর অর্থ জানতে আমার অনেক আগ্রহ হতো। দাদা প্রতিদিন সন্ধ্যায় পুঁথি নিয়ে বসতেন, দাদার পুঁথি পড়ার টানে আমাদের পাড়ার অনেক সংগীত পিপাশু গ্রামবাসী চলে আসতেন আমাদের বাড়িতে। অনেক রাত ধরে চলতো এই পুঁথি পাঠ। হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে আলোকিত করা হতো উঠান, তবে পূর্নিমার রাতে বাতি জ্বালানো হতো না। আমার আব্বাও

খুব সংগীত পিপাসু ছিলেন। আমার মাঝে সংগীত পিপাসা হয়তো সেজন্যই এতটা প্রবল। ভাটির গানগুলোর বৈচিত্রতা আমাকে বেশি আকর্ষণ  করে। এতো বর্ণিল এতিহ্য আমাদের ভাটি অঞ্চলের গানে। অসাধারণ সব প্রতিভার জন্ম এই ভাটি অঞ্চলে। শ্রমজীবী মানুষের বঞ্চনার অভিব্যক্তি শ্রমের ঘাম, আকুতি, আশাবাদ, সম্বলিত এসব গান আমাকে প্রতিনিয়ত টানে। ভাটি অঞ্চলের সাধারণ জনগণ ও গানের সমঝদারগণের সাথে যখনই কথা বলেছি, তারা কেমন যেন ভাবাতুর হয়ে যেতেন, উদাসীন হয়ে যেতেন তাদের চিরায়ত সেই মনের কথাগুলো বলতে গিয়ে। ভাটি অঞ্চলের গানগুলো যে মিশে আছে তাদের অস্তিত্বের সাথে।

ভাটি অঞ্চলের গানে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট স্পষ্টতই প্রতীয়মান। ভাটি অঞ্চলের মানুষ আবহাওয়াগত কারণেই আর্দ্র মনের অধিকারী। অর্থাৎ তারা খুব আবেগপ্রবণ। দারিদ্রতার ক্লীষ্ট জীবন তবুও তাদের আত্মসম্মানবোধ প্রবল। ভাটি অঞ্চলের গানে সে অঞ্চলের অধিবাসীদের মনের অবস্থানও স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত বিভিন্ন গণসঙ্গীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। সেসব গণসঙ্গীত ভারতবর্ষের রাজনীতিতেও যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বিখ্যাত সুরকার এবং গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গণসঙ্গীত ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলো। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর হেমাঙ্গ বিশ্বাসের *মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গলকাব্য*

পুরো ভারতবর্ষে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কৃষক আন্দোলন তথা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এসব গণসঙ্গীত রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনেও প্রভাব ফেলেছিলো। চল্লিশের দশকে আরেকটি বিখ্যাত গান "কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান" শ্রমজীবি মানুষকে উজ্জীবিত করেছিলো। এইসব গান পশ্চিমবঙ্গের বাম ফ্রন্টের রাজনীতিতে কংগ্রেসকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রেও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলো। ১৯৪৩ সালের দূর্ভিক্ষের সময় ধামাইল গীত ও সুর অবলম্বনে সৃষ্ট তাঁর কিছু গণসঙ্গীত গণমানুষের মন কেড়েছিলো। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৯৪৩ সালের দূর্ভিক্ষের ওপর একটি গান রচনা করেন। সে গানের লেখা ও সুরের উৎস ছিলো লোকসঙ্গীত:

দেশে যখন লাগলো আগুন শুন লো সজনী

চুপ করে আজ ঘরে বসে করব না বেইমানী লো

করব না বেইমানী।।

এই গানটি মানুষের মনে বেঁচে থাকার আশা জাগিয়েছিলো। তাঁর আরেকটি গণসঙ্গীতে তিনি

লিখেছেন যা নিম্নরুপ:

আমরাতো আর নেই অবলা

আগুন নিয়ে করব খেলা

খাদ্য-সংকট দুর করিব দেশ রক্ষার দায় লো।।

লাঠি খেল ছোরা ধর

এ আর পি তে শিক্ষা কর

আত্মরক্ষা বাহিনী গড় যাগায় যাগায় লো।

সমাজে মজুতদারদের একচ্ছত্র আধিপত্যের সামাজিক কাহিনী ফুটে উঠেছে তাঁর আরেকটি মজুতদার বিরোধী গানে:

তোরা শোনরে ভারতবাসী,

দেশদ্রোহী মজুতদার এরাই সর্বনাশী।

দেশ ভাগের পর তিনি লিখেছেন:

আমার শান্তির গৃহ সুখের স্বপন কে দিলো ভাঙিয়া

আমার মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগা।

বাংলার বিভক্তি তিনি মেনে নিতে পারেন নি। এর প্রতিফলনও আমরা তাঁর গানে দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন - বাঁচবোরে, বাঁচবো ভাঙ্গা বুকের পাঁজর দিয়া নয়া বাংলা গড়বো। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন নিয়ে তিনি 'ঢাকার ডাক' নামে একটি গান লিখেছিলেন -

শোন দেশের ভাই-ভগীনি

শোন আচানক কাহিনী,

কান্দে বাংলার জননী ঢাকার শহরে।

ও ভাইরে ভাই - একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনে

খুশির মধু নয় ফাগুনেরে

হঠাৎ দিন-দুপুরে অমানিশার

ঢাকলো অন্ধকারে।।

আবার আমরা ভাটি অঞ্চলের বিখ্যাত সুরকার ও গীতিকারগণের গানে ভাটির সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। যদিও এই গবেষণাটিতে উনিশ ও বিশ শতকের গীতিকারগণের গানের ওপর বেশি আলোকপাত করা হয়েছে তথাপিও এসব গান থেকেই ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের একটি সার্বিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কিশোরগঞ্জ জেলার পল্লী কবি শাহাব উদ্দিন তাঁর একটি গানে বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানিদের নির্মম শোষণ আর নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরেন -

গত তেইশ বছরে বাঙ্গালিরে করতো নির্যাতন, কত নেতা জেল

খাটিলো আয়ুবের কারণ।।

ভাটি অঞ্চলের এমন আরো অনেক গানে প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনেও গণসঙ্গীত ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলো। ভাটি অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি অর্থাৎ তাদের লেখা গানে। যেমন প্রমথ চৌধুরী বলেছেন --

হাত যন্ত্র বাজায় না, বাজায় প্রাণ;

গলা গান গায় না গায় মন।

ঠিক তেমনি গান বলে সে এলাকার মানুষের মনের কথা। ধর্মীয় বিষয়ে বাঙ্গালি বরাবরই অসাম্প্রদায়িক, যে কোন উৎসব পার্বন পালন করেন তারা সম্মিলিতভাবে। সামাজিক এই মেলবন্ধন সম্ভব হয়েছে তাদের এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির কারণেই।

সংস্কৃতির প্রতি ভাটির মানুষের যে আকর্ষণ, এটাইতো বাঙালির ঐতিহ্য। আমাদের  প্রাণের মাঝে বিরাজমান অসাম্প্রদায়িতাবোধ, সেটা টের পাওয়া যায় ভাটির গানে। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’। আগে একজন ব্যাক্তি মানুষ, তার পর তার ধর্ম। এই প্রগাঢ় সত্য স্পষ্টতই খুঁজে পাই আমার ভাটির গানে। ঈদ-মহরম, পূজা-পার্বণ সব উৎসব সবার। সকল প্রকার ধর্মীয় উৎসবের আনন্দ ভাগাভাগি করে মিলে মিশে আছে ভাটির সাধারণ জনগণ।

কাজল রেখার কাহিনীতে আমরা যেমন দেখি:

সোনার থালে বাড়ে কন্যা চিকন চালের ভাত।

ঘরে ছিলো পাতি নেবু কাইট্যা দিল তাত।।

সোনার বাটিতে রাকে দধি, দুগ্ধ ক্ষীর।

ঘরে মজা সবরীকলা কইরা দিল চির।।

আমার সুজলা-সুফলা এই দেশে অভাব ছিলো কম, সমাজ ছিলো শান্ত-সুস্থির। সমাজের এই চিত্র আমরা আমাদের ভাটির গানেই খুঁজে পাই। তাই আমার জোড়ালো বক্তব্য-ভাটির গান বিনোদনের প্রধান ধারা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনে জাতি আজ তার নিজস্ব লোক সংস্কৃতি হারাতে বসেছে। এখনি সময় শ্রোতা মহলকে নিজের সংস্কৃতির দিকে ফিরিয়ে আনা। বাংলাদেশে ডিস এন্টেনার আর স্যাটেলাইটের যুগে চ্যানেলের অভাব নেই, বর্তমানে কিছু অন লাইন চ্যানেলও চালু হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেলে প্রতি চ্যানেলই আমাদের ভাটি অঞ্চলের গানগুলো প্রচারিত হবে। পুরাতন শিল্পী, এখনো যাঁরা জীবিত আছেন, নিজের লেখা গান নিজেই পরিবেশন করলে নতুন শিল্পীগণ অনুপ্রাণিত হবে। তখন তারা নিজস্ব সংস্কৃতির বাইরে যাবে না।

সংস্কৃতির আদান প্রদান অবশ্যই কাম্য, তবে নিজের সংস্কৃতিকে হেয় করে নয়। সংগীত বাঙালির মজ্জাগত। বাঙালির জীবন-জীবিকা-ধর্ম-আচার সব কিছুতেই সংগীতের প্রভাব প্রতীয়মান। হাজার বছর ধরে লালিত সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই এক এক অঞ্চলের সংগীত রচিত হয়। নদী ও বর্ষার পানি বিধৌত আমার ভাটি অঞ্চলের সহজ সরল ও প্রাণবন্ত এই অসাধারণ প্রতিভাগণের স্বাক্ষর আমরা মুছে যেতে দিতে পারি না। ভাটির সংগীতপ্রিয় সরল মানুষগলোকে তাদের গান সম্পর্কে জানতে চাইলে কী যে খুশি হন, নিজের অভিব্যক্তি তুলে ধরেন সহজ

Dhaka University Institutional Repository

ও সাবলীল ভঙ্গিমায় ব্যাখ্যা করেন প্রানবণ্তভাবে। খুব মায়া হয় তাদের জন্য। কত পিছিয়ে আছেন তারা। যারা এক সময় আসরে গান করতেন, সমাজের প্রভাবশালীগণ তাদেরকে ডাকতেন গান শোনানোর জন্য। এখন আর তাদের ডাক  পরে না। অর্থের জন্য তারা লালায়িত নন। গান গেয়ে শুধু তৃপ্তি পেতে চান। গুণী এসব শিল্পীর পরিবেশনার জন্যই গানগুলো টিকে থাকবে। আকর্ষণীয় এসব গান বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে শুধু ব্যাপকহারে প্রচারণার জন্যই। ভাটি অঞ্চলের গান বুকে ধারণ করে অনেক সুরকার ও গীতিকারগণ নিজের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করেছেন। নিজের অস্তিত্বে স্বরূপ খুজার চেষ্টা করেছেন। হেমাঙ্গা বিশ্বাসের বিখ্যাত গণ সঙ্গীতের উৎস ছিলো মূলত ভাটিয়ালী গানের সুর। যা তিনি নিজেই গেয়ে উঠেছেন তাঁর আত্মপরিচয় (Identity) অনুসন্ধানমূলক ‘হবিগঞ্জের জালালী কইতর’ গানে। ১৯৬২ সালে লিখা এই গানে তিনি বলেছেন:

‘এই সুরের পালের দোলায়
খুশির হাওয়া বয়
এই সুরের দৌলতে আমি জগত করলাম জয়
তোমরা আমায় চিনছনি।

নির্মলেন্দু চৌধুরীর সাথে তিনি নিজেও এই গানে সুর দিয়েছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই গানের মাধ্যমে আবিষ্কার করলেন যে, ভাটি অঞ্চলের সুর তাকে কেবল বাংলাতে বা ভারতে বিখ্যাত করেনি বরং জগতদ্বিখ্যাত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতিবান এমন শিল্পীগণের কদর কমে যাচ্ছে দিন দিন। এই বোধ আমাকে ব্যথিত করে সব সময়। মূলত এই তাগিদ থেকেই ভাটি অঞ্চলের গানের উপর আমি গবেষণা করেছি। শিল্প, জীবনের কর্মকাণ্ড, ভাবনা-চিন্তা, সংগ্রাম এসবের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় সংগীত। একটি অঞ্চলের সংগীত সে সমাজের সংস্কৃতির একটি ছবি তুলে ধরে শ্রোতার সামনে। আমার ভাটির গান গুলোও তেমনি তার সমাজকে শ্রোতার সামনে তুলে ধরে, সে সব গানে নেই কোনো কৃত্রিমতা, নেই কোনো ছলচাতুরী। সহজ-সরল প্রাণবন্ত ভাটির এই গানগুলো টিকে থাকুক জীবনভর। মানুষের সুকুমার বৃত্তির অন্যতম আধার হল তার সংগীত। যে সমাজে সংগীত নেই সে সমাজ কুলষিত হতে বাধ্য, আমরা সে সমাজ চাইনা, সে সমাজ কারো কাম্য নয়। ভাটি অঞ্চলের বিনোদনের প্রধান ধারা আমাদের এই গানগুলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে জীবন ভর। এই গান গুলো গবেষণার মাধ্যমে সংরক্ষণ না করলে হারিয়ে যাবে, তাই প্রচুর পরিমানে এসব গানের উপর গবেষণা হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। বর্তমানে অনেক অনেক বিষয়ের উপর গবেষণা হচ্ছে - এটা আমাকে আশান্বিত করে। ভাটি অঞ্চলের গানের উপর প্রচুর গবেষণা হওয়া উচিত। তাহলেই টিকে থাকবে গানগুলো, আমাদের সংস্কৃতিও হবে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। এই আশাবাদ থেকেই অত্র গবেষণার প্রয়াস।

Dhaka University Institutional Repository

# তথ্যপঞ্জি:

## ক. গ্রন্থ:

১। বিশ্বাস, হেমাঙ্গ, *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা সংগ্রহ ১* (কলকাতা: দে'জ, ২০১২)

২। ওয়াহাব, আবদুল, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বাকি আখ্যান,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭)

৩। চৌধুরী, কমল, *মৈমনসিংহের ইতিহাস (সম্পা),* (কলকাতা: দে'জ, ২০০৫)

৪। হক, মোহাম্মদ মুমিনুল, *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত,* (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০)

৫। খান, শামসুজ্জামান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সম্পা),* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪)

৬। সেন, শ্রী দীনেশচন্দ্র রায়বাহাদুর, *পূর্ববঙ্গ: মৈমনসিংহ-গীতিকা (সম্পা),* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০০)

৭। ইলিয়াস, মাহবুব, *লোকসাহিত্যে ছড়ানাট্য ও লোকসঙ্গীত (সম্পা),* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯)

৮। মিলকী, শামসুজ্জামান, *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি প্রেক্ষিত ভাটি অঞ্চল,* (ঢাকা রোদেলা, ২০১৩)

৯। হোসাইন, আবু আলী সাজ্জাদ, *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* (ঢাকা: জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ১৯৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

১০। খান, শামসুজ্জামান, (সম্পা), *বাংলাদেশের লোক সংগীত সমীক্ষা,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩)

১১। হোসেন, ড. আশফাক, *মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জন্ম ও জাতিসংঘ,* (ঢাকা: প্রথমা, ২০১২)

১২। খাঁ, জালাল উদ্দিন, *বিশ্ব রহস্য,* (কিশোগঞ্জ: কিশোর প্রকাশনী)

১৩। খাঁ, জালাল উদ্দিন, *জালাল গীতকা,* (কিশোগঞ্জ: কিশোর প্রকাশনী)

১৪। রায়, সুচরিতা, (সম্পা), *অমর শীলের গান,* (ঢাকা: নিবেদন, ২০০৮)

১৫। খান, শামসুজ্জামান, (সম্পা), *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন-৬৪ খন্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

১৬। খান, শামসুজ্জামান, (সম্পা), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: নেত্রকোনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৩)

১৭। হক, মোহাম্মদ নাজিমুল, (সম্পা), *ইতিহাস চর্চায় বাচনিক উপকরণ,* (রাজশাহী: আই. বি. এস, ২০১৭)

১৮। রেজা, শাহিনুর, (সম্পা), *সংগীত ধর্মের আলোকে,* (ঢাকা: অঙ্কুর, ২০০৫)

১৯। সেন, শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়বাহাদুর, (সম্পা), *মৈমনসিংহ গীতিকা* (ঢাকা: শোভা, ২০১০)

২০। মুখোপাধ্যায়, জগমোহন, *গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা,* (কোলকাতা: আনন্দ, ২০১৮)

Dhaka University Institutional Repository

২১। চৌধুরী, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন, *সিলেট বিভাগের ইতিহাস,* (ঢাকা: দশদিশা, ২০০৬)

২২। খান, এম এইচ ফরহাদ ও অন্যান্য (সম্পা), *বড়লেখা অতীত ও বর্তমান,* (ঢাকা: বাংলাদেশ রাইটার্স গিল্ড, ২০০০)

## খ. সাক্ষাৎকার:

০১। অমরশীল, ১৩/১২/২০১৭. কিশোরগঞ্জ।

০২। অর্চনা রানী শীল, ১৩/১২/২০১৭. কিশোরগঞ্জ।

০৩। এ্যাডভোকেট এ, কে, এম, উবাইদুল হক (উবায়েদ),

১০/০২/২০১৯. সিলেট।

০৪। এ্যাডভোকেট সজয় চক্রবর্তী, ২৫/০৩/২০১৭. নেত্রকোণা।

০৫। খাইরুল আলম বাদল, ১২/১২/২০১৭. কিশোরগঞ্জ।

০৬। মো: জাবের হোসাইন, ১০/০১/২০১৭. হবিগঞ্জ।

০৭। জানে আলম নান্নু, ১২/১২/২০১৭. কিশোরগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

০৮। দীন ইসলাম বাচ্চু, ১২/১২/২০১৭. কিশোরগঞ্জ।

০৯। মো: মক্তুবুর রহমান, ২৯/১০/২০১৬. সুনামগঞ্জ।

১০। মাধবী রানী শীল, ১৩/১২/২০১৭. কিশোরগঞ্জ।

১১। শফিউল আলম স্বপন, ২৪/০৩/২০১৭. নেত্রকোণা।

১২। শাহিদা আফরোজ, ২৪/১২/২০১৫. মৌলভীবাজার।

১৩। সাবেরা সুলতানা ইমন, ১৮/১০/২০১৮. ব্রাহ্মনবাড়িয়া।

১৪। সুজন চন্দ্র শীল, ১৩/১২/২০১৭. কিশোরগঞ্জ।

১৫। হীমাংশু ভৌমিক, ১২/১২/২০১৭. কিশোরগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

## গ. গানের সিডির তালিকা:

০১। ইসলাম,আমিরুল, (গ্রন্থনা), '*কূলহারা কলঙ্কিনী,* (ঢাকা: ফাহিম মিউজিক)

০২। মং, থিন হান (তিতি), *বাউল শাহ্ আব্দুল করিম,* (ঢাকা: সাউন্ড মেশিন, ২০০৬)

০৩। মোনায়েম সরকার (সম্পা), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম,* (ঢাকা: বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ)

০৪। *বাংলাদেশ লোক সঙ্গীত উৎসব,* ডিভিডি ১ ও ২ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৮)

০৫। *বাংলাদেশ লোক সঙ্গীত উৎসব,* ডিভিডি ৩ ও ৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৮)

০৬।*বাংলাদেশের বাউল গান,* (ঢাকা: Bangladesh German Cultural Association)

০৭। *লীলাবতি, বারী সিদ্দিকী,* (ঢাকা: গানচিল)

০৮। *লোকগান, বন্ধুয়া, স্বপন বসু* (ঢাকা: Sa re ga ma)

Dhaka University Institutional Repository

০৯। মোহাম্মদ শাহীন হোসেন (সম্পা), *জাতির জনক,* (ঢাকা: ডিজিটাল ভিউ)

১০। জাহাঙ্গীর (সম্পা), *মাঝি নাও ছাইড়া দে, সাবিনা ইয়াসমিন* (ঢাকা: Soundtek)

১১। *খাঁচার ভেতর অচিন পাখি,* ফরিদা পারভীন (ঢাকা: সারগাম)

১২। এম. এ. মোনায়েম সরকার (সম্পা), *ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ শোষণ, নৃশংসতা ও সাংস্কৃতিক মূলোৎপাটন এর ইতিহাস* (ঢাকা: ডিজিটাল ভিউ)

১৩। Jane Alam, Disc-1 (ঢাকা: দোয়েল প্রোডাক্ট)

১৪। Jane Alam, Disc-2 (ঢাকা: দোয়েল প্রোডাক্ট)

১৫। Jane Alam, Disc-3 (ঢাকা: দোয়েল প্রোডাক্ট)

Dhaka University Institutional Repository

## online উৎস:

01.https:// *Youtube*/watch02/01/2020

02. https://m.youtube.com-watch07/01/2020

03. https://archive.ittefaq.com.bd-watch07/01/2020

04. #HEMANGOBISWAS#Shankhachiler#Hemanga-
(watch31/12/2019)

05. #rojaentertainment#lokogiti#chhotaandulia
(watch21/12/2019)

06. https://youtu.be/j19v3hSwmag

07. #GreatestBengaliSong#BengaliFolksongs#ভাটিয়ালী
(watch07/01/2020)

08. #kanonbala#kanonbalaSonali#SonaliProducts
(watch06/01/2020)

09. #কুদ্দুসবয়াতি#সেরা_গান#লাইভটিভিশো, publishedon20/03/2018
(watch09/12/2019)

10. #RabbitholeTVShow, publishedonFeb13, 2019

Dhaka University Institutional Repository

(watch07/01/2020)